আহলুল কিবলা ও তাওয়িলকারীরা
- শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি
দারুল ইরফান

আহলুল কিবলা ও তাবীলকারীরা

শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

শাইখ আবু কাতাদা ওমর মাহমুদ ওসমান হাফিযাহুল্লাহ একজন ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভুত এক জর্ডান প্রবাসী আলেম। দাওয়াতি তৎপরতার কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে তাঁকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে তলব করা হয়েছে। পরবর্তীতে জর্দানের ছোট্ট রাষ্ট্রে তাঁর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ জারি করা হয়েছে। তিনি বৃটেনেও কারাভোগ করেছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে আমরিকান প্রশাসনের অভিযোগ, তিনি সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়দার মুফতি পদে কাজ করেন। আরো বলা হয়েছে, শহীদ মুহাম্মাদ আতা ও তার সহযোদ্ধাগণ জার্মানের যেই এপার্টমেন্টে থাকতেন সেখানে করা তাঁর কিছু আলোচনার উপর ইতোমধ্যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনিত এই অভিযোগের ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে বলেন, মুজাহিদিনদের সাথে তাঁর সম্পর্ক অন্য যে-কোন মুওয়াহ্হিদ ও মুমিনের সাথে সম্পর্ক রাখার মতই। ভিন্ন কোন কিছু এখানে নেই। প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক ও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব যে কোন সংগঠনের চেয়েও মজবুত ও শক্তিশালী।

তিনি উসুলে ফিকহের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

যারাই শাইখের লিখনী হাতে পাবে তারাই অনুভব করতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সালাফ-পূর্বসূরীদের মানহাজ সম্পর্কে কী অগাধ জ্ঞান দান করেছেন। তিনি প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদ-সংস্কারকদের মতো সালাফের রীতি অনুসরণ করে উসুলুল ফিকহ এবং ঈমান ও আকিদাগত বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এক্ষেত্রে তিনি মুতাকাল্লিমদের পদ্ধতি পূর্ণ মাত্রায় বর্জন করেন যারা ইলমে দ্বীনকে শেষ করে দিয়েছে। তবে তাদের মানহাজের বিস্তারিত জ্ঞান

যেমন তাঁর ছিল তেমনি তাদের খণ্ডন করার সর্বোত্তম পদ্ধতিও তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন। এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানব-জীবনের সমস্যা নিয়ে তাঁর রয়েছে বিশেষ দর্শন যা তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও দূরদর্শিতার প্রতি ইঙ্গিত করে। শরিয়ত ও তাকদীরী বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার ফলেই তাঁর এ-সব যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। অথচ শরিয়ত ও তাকদিরের থেকে কোন আলেমই গাফেল থাকেন না। তারপরেও যিনি এগুলোকে সবসময় নিজের চোখের সামনে রাখেন এবং এটাই হয় তাঁর একমাত্র কর্ম ব্যস্ততা তাঁর সামনে তখন খোলে দেয়া হয় ইলম এবং জ্ঞানের দরজাসমূহ। তখন তাঁর ভিন্ন একটা অবস্থান তৈরী হয়।

যেহেতু উসুলে ফিকহ -যা দর্শনগত মৌলিক একটি জ্ঞান- নিয়েই তাঁর যাবতীয় ব্যস্ততা তাই এর বদৌলতে এমন দর্শনগত যোগ্যতা তিনি লাভ করতে পেরেছেন যে, প্রতিপক্ষের বিভিন্ন জাওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের বিষয় পড়ার সময় তাঁর চক্ষু সেই দর্শনগত যোগ্যতাকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে না। অনুরুপভাবে এই উসুলে ফিকহের প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব দেয়ার কারণেই এমন গভীর দূরদৃষ্টি লাভ হয়েছে যার আলোকে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত আকিদা-বিশ্বাসের কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা নির্ণয় করতে পারেন। তাদের এই অবস্থার প্রকৃত কারণ ও রোগ উদঘাটন করতে সক্ষম হন। তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানেন ততটুকুর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের প্রত্যেক সদস্য ও দলের কী হুকুম তাও বলে দিতে পারেন। তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা এত বেশি যে, বর্তমানে বিদ্যমান যত ভ্রান্ত দল আছে সবগুলোকে অতীত ও বর্তমানকালের এ-জাতীয় অন্যান্য দলের সাথে তুলনা করে তিনি গবেষণা করেন। একটিকেও বাদ দেন নি।

সর্বোপরি তিনি তো একজন মানুষ। তাই অন্যান্যদের মত তাঁরও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। কখনই তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন। ইসলামী আন্দোলন যদি তাদের নেতা ও আলেমদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখে এবং তাদেরকে এমন স্তরে রাখে যে, তাদের কোন কিছুই খণ্ডন করা যাবে না তাহলে তো তারা কখনোই আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না এবং দায়িত্বশীল কোন জাতি গঠন করতে পারবে না। বরং এদের লালন পালন হবে সেই প্রকৃতিতে যেই প্রকৃতিতে লালিত পালিত হয়েছে প্রত্যেক গলাবাজের অনুসারী আবিদরা, যারা তাদের নেতার সম্মানে অতিরঞ্জন করে, তাকে তাই দেয় যেটার উপযুক্ত সে নয়। যেমন, শুধু এদের আস্থা অর্জনের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা এবং এর দায়ভার নেয়া। বাস্তবতা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ইলমী কারনামা:

[১] তাঁর সর্বপ্রথম কিতাব হল, 'আর-রদ্দ আল-আসারি আল-মুফিদ আলাল বাইজুরি ফী শরহি জাওহারাতিত্ তাওহিদ'। দ্বিতীয় মুদ্রণ।

[২] ইবনুল কায়্যিম রচিত 'তরিক আল-হিজরতাইন'। শাইখের তাহকিকে ছেপেছে দারু ইবনিল কাইয়্যিম, রিয়াদ। দ্বিতীয় মুদ্রণ।

[৩] হাফেজ হুকমী রচিত 'মাআরিজ আল-কবুল ফী শরহি সুল্লাম আল-উসুল'। খণ্ড:৩। শাইখের তাহকিক ও তাখরিজে কিতাবটি পাঁচবার মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমে ছেপেছে দারু ইবনুল কাইয়্যিম এরপর দারু ইবনে হাজম।

[৪] ‘তাজরিদ আল-আসমা আর-রুওয়াত আল্লাযিনা তাকল্লামা ফীহিম ইবনু হাজম জারহান ওয়া তা'দিলান’।কিতাবটি শাইখ এবং আরো কয়েকজন মিলে লিখেছেন। কিতাবটি ছেপেছে জর্দানের দারুল মানার কুতুবখানা।

[৫] ইবনে কুতাইবা রচিত ‘আল-এখতেলাফ ফিল-লফজ’।শাইখের তাহকিকে কিতাবটি ছেপেছে দারুর-রায়াহ।

[৬] ইবনুল কাইয়্যিম রচিত ‘আল-গুরবা’।শাইখের তাহকিকে কিতাবটি ছেপেছে দারুল কুতুব আল-আছারিয়্যা।

[৭] নিজস্ব রচনা- ‘আল-জিহাদ ওয়াল ইজতেহাদ: তাআম্মুলাত ফিল মানহাজ’। কিতাবটি মূলত তাঁর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ যা 'নাশরতুল আনসার' বাইনা মানহাজাইন শিরোনামে প্রকাশ করেছে। কিতাবটি জর্দানের দারুল বায়ারিক থেকে ছেপেছে।

[৮] ইমাম আল-বারকাঈ রচিত ‘কাসরুস-সনাম’। কিতাবটি জর্দানের দারুল বায়ারিক থেকে শাইখের তাহকিকে ছেপেছে।

[৯] নিজের রচিত ‘মাআলিমুত্ তাইফাতিল মানসুরাহ’। ডেনমার্কের দার্ আন-নুর আল-ইসলামি থেকে দুইবার ছেপেছে।

[১০] ‘হুকমুল খুতাবা আল্লাযীনা দাখালূ ফী নুসরাতিত্ তাগুত’। এই কিতাবটিতে মূলত সে-সব উলামায়ে সু-দের সম্পর্কে মালেকী মাজহাবের ইমামদের ফতোয়া আছে যারা আবিদিইয়্যীনদের সাহায্য করেছে। শাইখের তাহকিক ও তা'লীকসহ কিতাবটি ডেনমার্কের দার্ আন-নুর আল-ইসলামি থেকে ছেপেছে।

[১১] ‘নাজরাতুন জাদিদা’।

[১২] ‘জু’নাতুল মুতাইয়্যিবীন’।

এ-ছাড়াও শাইখের আরো কিছু মূল্যবান গবেষণা আছে। যেই এগুলো পড়বে সেই তাঁর কদর বুঝতে পারবে।

প্রবন্ধ ও রচনার অঙ্গনেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলো যদিও ছোট কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে একজন মুসলমানের শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত তা সংক্ষিপ্তভাবে প্রবন্ধটিতে উঠে এসেছে। তিনি প্রায় দু'শত প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এ-সব লেখা নাশরতুল আনসার, মাজাল্লাতু নিদাইল ইসলাম, মাজাল্লাতুল মিনহাজ ও মাজাল্লাতুল ফজর-সহ আরো কয়েকটি ইসলামি পত্রিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে।

এ-সব লিখনীতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঙ্গনে তাঁর দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার দিকটিও সমানভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের রচিত কিছু কবিতাও আছে।

তিনি শিক্ষাদানের জন্য সরাসরি আলোচনার আয়োজন করতে ভুলে যান নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইলমী আলোচনার আয়োজন করেন। তার এই সমস্ত আলোচনা যারাই শুনেছেন তাদের সকলেই তাঁর ইলমের গভীরতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এগুলোর রেকর্ড এখন অনেক তালেবে ইলমের হাতে হাতে পাওয়া যায়।

তেমনি কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নে দেয়া হল:

[১] ইমাম যাহাবি কর্তৃক রচিত শরহুল মুকিজা

[২] আল-ঈমান। এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে ঈমান কাকে বলে, সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাথে সাথে বিদআতপন্থীদের মতকেও খণ্ডন করেছেন।

[৩] শরহু আকিদাহ আত্তাহাবিয়্যাহ।

[৪] আল্লামা শাওকানী কর্তৃক রচিত শরহুদ-দারারী আল-মুযিয়্যাহ।

[৫] ইবনে রজব হাম্বলী কর্তৃক রচিত 'তাকরির আল-কাওয়ায়েদ ওয়া তাহরির আল-ফাওয়ায়েদ'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

[৬] মুতাকদ্দিমীনের অনুসৃত পন্থায় উসুলে ফিকহ সম্পর্কে একটি মুকাদ্দামার ব্যাখ্যা করার জন্য আলোচনার আয়োজন করেন।

[৭] ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক রচিত জামাউল ইলমের ব্যাখ্যা।

এখানে শাইখের জীবনীর সামান্য অংশই তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এইটুকু এই শাইখের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় কিন্তু এতে শাইখের জীবনের মৌলিক দিকগুলো উঠে এসেছে।

পরিশেষে মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি শাইখকে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। তাঁর হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। তাঁর ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সব সাহাবির ওপর।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا وستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها، وحسابهم على الله)

“আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকি, যাবৎ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। তারা যখন এটা বলবে, আমাদের সালাতের মতো সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খাবে, তখন আমাদের ওপর তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হয়ে যাবে; তবে তার হকের কথা ভিন্ন আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।” [১]

---

[1] বুখারী শরীফ

ভূমিকা ও প্রসঙ্গ কথা

আল্লাহর শরিয়াতের ওপর ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার কুপ্রভাব

‘আনুষ্ঠানিকতা’-র আরবি শব্দ হচ্ছে النّمطيّة, যার আভিধানিক অর্থ—রীতি-নীতি, পদ্ধতি। এখানে النّمطيّة দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরঈ বিধি-বিধান ও ইলমসমূহের যেকোনো বিন্যাস-পদ্ধতি। বিধানগুলোকে একেকটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবদ্ধ করে ফেলা, যার ফলে বিধানগুলো উক্ত কাঠামোর অধীন হয়ে যায়। কাঠামোটি বিস্তৃত হলে বিধানগুলোও বিস্তৃত হয়, আর কাঠামোটি সংকীর্ণ হলে বিধানগুলোও সংকীর্ণ হয়। যখনই সুন্নাতে নববিয়াহ্‌র গুরুত্ব হালকা হয়ে গেল, তখনই মুসলিমরা পাঠদানকারী, তাবীলকারী ও মুফতিদের কাছে এসে ইসলামকে সহজ করার প্রয়াস পেল—ইসলামকে কতগুলো সীমাবদ্ধ নীতিমালার মাঝে কেন্দ্রীভূত করে ফেলার মাধ্যমে এবং অধিকাংশ নীতিমালাগুলোকে আবার এক একটি শব্দের মাঝে নিয়ে আসার মাধ্যমে। এ কাজের কিছু কিছু দিক ভালো থাকলেও দ্বীন ও শরিয়াতের ওপর এর ক্ষতিকর দিকগুলো ছিলো মারাত্মক। কিছু ক্ষতি

হলো মুলনীতিগত দিক থেকে, আর কিছু ক্ষতি হলো মানুষের মাঝে তা ভুল পন্থায় চালু করার দিক থেকে।

ইমামগণ গবেষণা করে আল্লাহর শরিয়াতের সাথে যেসব আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনগুলো যোগ করেছেন সেগুলো:

১. সংজ্ঞাসমূহ
২. ফিকহি মূলনীতিসমূহ।
৩. প্রতীক ও উপাধিসমূহ।
৪. ফিকহি আকিদাহ্-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপ।

শরিয়াতের ওপর সীমাবদ্ধ সংজ্ঞাগুলোর কুপ্রভাবের নমুনা:

এই ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার সবচেয়ে বড় নমুনার একটি হলো, শরঈ পরিভাষাগুলোকে সংজ্ঞা দেয়ার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ কাঠামোর মাঝে আবদ্ধ করে ফেলা। যেমন ঈমানের সংজ্ঞা প্রদানের নমুনা দেখুন:

যখন মুসলিম উম্মাহ ইউনানি দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, অপরদিকে এরিস্টটলের তর্কশাস্ত্র উসুলবিদ ও ফিকহবিদ মুতাকাল্লিমদের জ্ঞানজগতে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তখন তারা অ্যারিস্টটলীয় সীমাবদ্ধ কাঠামোতে ইমানের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করল।

ফলাফল ছিলো ধ্বংসাত্মক, বিনাসী। দ্বীনের ওপর মিথ্যারোপ ও দ্বীনকে অন্তঃসারশূন্য করার খেলা জমে ওঠলো।এই প্রকাশ্য ঘটনা এবং এর কুফলগুলোর দীর্ঘ ব্যাখ্যায় আমি যাবো না। এক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর চমৎকার দুটো কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। একটি হলো الرّد على المنطقيّين (মানতিকিদের খণ্ডন), আরেকটি الإيمان الكبير (আল-ঈমানুল কাবির)।তাই, এ দুটো কিতাবের শরণাপন্ন হতে পারেন। কিতাব দুটো এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পর শাইখ ড. সফর আল-হাওয়ালি (আল্লাহ তাকে সৌদি তাওয়াগিতের

কারাগার থেকে মুক্ত করুন!) তাঁর কিতাব ظاهرة الإرجاء في الفكر الاسلامي (ইসলামি আকিদা জগতে প্রকাশ্য ইরজা) এর মাঝে এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার কোনো তুলনা হয় না।

শরিয়াতের ওপর, আকিদাহ্ ও ফিকহ বিষয়ক বহু গ্রুপের কুপ্রভাব:

যখন ফকিহ্গণ শরিয়াতকে ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আকায়িদ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করল, এর ফলাফল কী হলো? নি:সন্দেহে এটা শরিয়াতকে নষ্ট করে দিল। এটা এমন বিপর্যয় ছিলো, যার কুপ্রভাবগুলো আমরা আমাদের বর্তমান সমাজে সব চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, এর কুপ্রভাব সর্বোচ্চ যে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিলো, আমাদের যামানায় সে পর্যন্তই পৌঁছেছে।

যার ফলে মুআমালাত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়, এর জন্য আছে ভিন্ন হুকুম ও মূলনীতি। আবার ওটার জন্য আছে ভিন্ন রকম হুকুম ও মূলনীতি। এমনিভাবে আকায়িদ শাখাগত বিধি-বিধান থেকে ভিন্ন জিনিস। তাই আকায়িদের জন্য আছে তার নির্দিষ্ট মূলনীতি ও অধ্যায় আর আহকামের জন্য আছে তার নির্দিষ্ট মূলনীতি ও অধ্যায়। আবার আকায়িদ 'ইয়াকিনি' (সুনিশ্চিত!) আর আহকাম হলো 'যন্নি' (প্রবল ধারণা-নির্ভর!)

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাঁর কিতাব 'আল-ইস্তিকামায়' বলেন:

(فصل مهمّ عظيم في هذا الباب: وذلك أنّ طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة - وهو أصل في هذا الباب-... ومن اتّبعهم من الفقهاء يعظّمون أمر

الكلام الذي يسمّونه أصل الدين، حتّى يجعلون مسائله قطعيّة، ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال، حتى يجعلوه من باب الظّنون لا العلوم، وقد رتّبوا على ذلك أصولا انتشرت في النّاس حتّى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصّوفية وأهل الحديث لايعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من المفاسد مع أنّ هذه الأصول التي ادّعوها في ذلك باطلة واهية... ذلك أنّهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معيّنا، حتّى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حقّ كلّ شخص ما أدى إليه اجتهاده، وقد بيّنا في غير هذا الموضع ما في هذا من السّفسطة والزّندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الإجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا... ومن فروع ذلك أنّهم (يزعمون أنّ ما تكلّموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعيّة يقينيّة

“এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ: মুতাযিলি মুতাকাল্লিমদের বড় একটি অংশ এবং তাদের অনুসারী ফকিহ্গণ ইলমুল কালামের মর্যাদা অনেক উঁচুতে তুলে এটাকে ‘দ্বীনের মৌলিক বিষয়’ বলে নামকরণ করে থাকে। ফলে এর মাসআলাগুলোকে বলে ‘কাতয়ি’ বা অকাট্য। আর ইলমুল ফিকহকে দেখে হালকা করে, যা হচ্ছে কাজের বিধি-বিধান জানার নাম। এমনকি এগুলোর (ফিকহের) ইলমকে ‘ধারণা-নির্ভর’ মনে করে; নিশ্চিত ইলম মনে করে না। তারা এর ভিত্তিতে বহু মূলনীতিও গড়েছে, যেগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে আছে। ফুকাহা, সুফি ও মুহাদ্দিসগণের একটি দলও এর মাঝে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা জানে না, এর গোড়া কী এবং পরিণতিতে এটা কী বিকৃতি তৈরি করবে; অথচ তারা এক্ষেত্রে যে মূলনীতিগুলো দাবি করে, তা একেবারে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। সেই বিকৃতির ফলাফল হলো, বিধি-

বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দিষ্ট কোনো হুকুম আছে বলে মনেই করে না তারা, যার ফলে মুজতাহিদ সঠিক ও ভুলকারী হিসাবে বিভক্ত হতো; বরং তারা প্রত্যেক মুজতাহিদের ক্ষেত্রে হুকুম সেটাই মনে করে, যেটা ইজতিহাদে (গবেষণায়) বের হয়ে এসেছে। এর মাঝে যে কতটা নির্বুদ্ধিতা ও বিকৃতি রয়েছে, তা আমরা অন্য স্থানে পরিস্কারভাবে আলোচনা করেছি। ফলে তারা ইজতিহাদের স্থানগুলোতে আল্লাহর নির্দিষ্ট কোনো হুকুম আছে বলে মনে করে না এবং এ ব্যাপারে তার কোনো মূল দলিল আছে বলেও মনে করে না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, তারা মনে করে, তারা যে ইলমুল কালামের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, শুধু সেগুলোই হলো অকাট্য ও নিশ্চিত”।[২]

দেখুন, কতিপয় লোকের শরিয়াতকে আনুষ্ঠানিক ভাগাভাগির প্রচেষ্টা! তথা সালাফের ফিকহের সাথে সম্পর্কহীন অভিনব ফিকহ তাদের কোন দিকে পৌঁছিয়েছে? তারা দ্বীনকে “অপরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল” এ দুভাগে ভাগ করেছে। তারপর প্রত্যেকেই পরিবর্তনশীলের পরিধি বিস্তৃত করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যাতে সালাফের অবস্থান-বিরোধী নতুন নতুন ইজতিহাদ যুক্ত করার প্রশস্ত ময়দান তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এখনো কেউ দুটোর মাঝে পার্থক্যকারী কোনো স্পষ্ট ইলমি সীমারেখা নির্ধারণ করতে সফল হয়নি, বরং সব হলো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

---

[২] আল ইস্তিকামাহ-৪৭ পৃষ্ঠা

এই কুপ্রভাবের আরেকটি উদাহরণ:

তাতাররা মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। সেনাপতি কাযানের নেতৃত্বে তাদের আক্রমণ সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। আর আগেই তারা শিয়া মাযহাব মতে ইসলাম-গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলো।তাই কাযানের সাথে ইমাম, মুআজ্জিন ছিলো।যখন তাদের ঘৃণ্য আক্রমণ দামেশকের দুর্গগুলো পর্যন্ত পৌঁছে গেল, সেই সময় মানুষ তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাসআলা নিয়ে বিতর্ক শুরু করে দিল—ফকিহ্গণ এ বিষয়ে যে বিভিন্ন প্রকার বানিয়েছেন, তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেগুলোর কোন প্রকার ও কোন অধ্যায়ের অধীনে পড়বে?!

চলুন ইবনু কাসির (রহ.) থেকেই শুনি সেই সময়ে মানুষের ঘোলাটে পরিস্থিতির কথা:

ইবনু কাসির (রহ.) বলেন-

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام، وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه، فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على عليّ ومعاوية، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك

"মানুষ এসব তাতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধরন নিয়ে আলোচনা শুরু করল, অর্থাৎ এ যুদ্ধটা কোন প্রকারের যুদ্ধ হবে? তারা ইসলাম প্রকাশ করছে আবার ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীও নয়। যেহেতু তারা কখনো তার আনুগত্যের মাঝে ছিলোই না যে, তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। তখন শাইখ তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বললেন—এরা ওইসব খারিজিদের মতো, যারা আলী ও মুআবিয়া (রা.) এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিলো এবং তারা মনে করেছিলো, তারাই খিলাফতের অধিক যোগ্য; ঠিক এরাও মনে করছে, হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারাই মুসলমানদের চেয়ে অধিক হকদার আর মুসলমানদেরকে তাদের গুনাহ ও জুলুমের কারণে দোষারোপ করছে, অথচ তারা এরচেয়ে আরো কয়েক গুণ বড় গুনাহে লিপ্ত। তখন উলামা ও অন্যান্য মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হলেন।"[3]

মানুষ এ ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) প্রথমে খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বের করার প্রয়োজন বোধ করলেন। কারণ, পরবর্তী যামানার আলিমদের নিয়মের আলোকে অধ্যায় আকারে সাজানো অধিকাংশ ফিকহের কিতাবেই খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি তাদের

[3] আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১৪/২৪

কাছে খারিজি অর্থই হয়ে গেছে—যারা ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) সর্বপ্রথম এই অধ্যায়করণ ও প্রকরণের ভ্রান্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটিকে ভিন্ন প্রকারে নামকরণ করেছেন—শরিয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। শাইখ (রহ.) খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা, যখন মানুষ ব্যাপকভাবে এটা ব্যবহার করবে, তখন যেকোনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনেক শাখাগত বিধি-বিধান বিকৃত হয়ে যাবে। যেমন, খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাবীলকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে, যেমনটা সবাই জানে। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধ করেছেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে। তাই এ থেকে জানা গেল, ‘শরিয়াতের বিরোধিতাকারী দল’ কথাটি যুদ্ধের এমন কোনো প্রকারের ব্যাখ্যা করে না, যেটা ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর যামানায় তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে সৃষ্ট সংশয় দূর করতে পারে। এ কারণে যারা ‘শরিয়াতের বিরোধিতাকারী’ কথাটির অর্থ করে ‘সাধারণ কাফির’, তারাও ভুলকারী। আবার যারা এর অর্থ করে ‘তারা একেবারেই কাফির নয়’, তারাও ভুলকারী। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

আল্লাহর শরিয়াতের ওপর ফিকহি মূলনীতিসমূহ না বোঝার কুফলসমূহ:

ফিকহি কায়িদা বা সূত্র বলা হয় এমন সামগ্রিক হুকুমকে, যা অনেকগুলো এককের ওপর প্রযোজ্য হয়। ফলে উক্ত এককগুলোর হুকুম উক্ত সামগ্রিক হুকুম থেকে জানা যায়। মুতাআখখিরিন (পরবর্তী যামানার) আলিমগণ গোটা শরিয়াতকে কিছু সীমাবদ্ধ কায়িদা বা সূত্রের মাঝে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। যেগুলোর একেকটি অনেক সমস্যার সমাধান সহজ করে দেয়। তাদের কেউ কেউ মাত্র সতেরোটি মূলনীতির মাঝে শরিয়াতকে জমা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমনটা আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবে ইবনু নুজাইম আল-হানাফি উল্লেখ করেছেন; অথচ এ আলিমগণই তার সাথে এ শর্তও যুক্ত করেন যে, এসব সূত্র প্রাবল্য ও সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে; প্রতি সদস্যের বিবেচনায় নয় এবং এসব কায়িদা ও সূত্র দ্বারা ফাতওয়া দেয়া যাবে না। কারণ, এগুলো প্রতিটি এককের ওপর প্রযোজ্য হয় না; বরং এগুলো বানানো হয়েছে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বলে থাকে—শাখাগত বিধি-বিধানকে এগুলোর দিকেই ফেরানো হবে এবং এগুলোর মাধ্যমেই একজন ফকিহ ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছুতে পারবে। এর কারণে মানুষ মহান সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। কেন

শত-শত, হাজার-হাজার হাদিস মুখস্থ করতে হবে? বিষয় তো এর চেয়ে অনেক সহজ! মাত্র সতেরোটি কায়িদা মুখস্থ করা। এমন কি এর দ্বারা একজন ব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে যায়! ফলে পরবর্তীতে অনেকের কাছে এই ফিকহি কায়িদাগুলোই ইজতিহাদ ও ফাতওয়ার একমাত্র উৎস হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা যে কথাটি শুনতে পাচ্ছি, 'কল্যাণ বা সুবিধা বিবেচনা করা শরঈ বিধান আহরণের একটি উৎস', এটা হচ্ছে এই সূত্রের কুফল: المشقة تجلب التيسير—কষ্ট সহজকরণ দাবি করে। যাতে এমন যেকোনো শরয়ঈ বিধানকেই রহিত করে দেয়া যায়, যেটা মানুষ কষ্টকর বলে মনে করে। তাদের এ কাজগুলো হলো অজ্ঞতার দুঃসাহসিকতা এবং ইলম ছাড়া যেকোনো মানুষের আল্লাহর ওপর কথা বলা ও ফাতওয়া দেয়ার অশুভ পরণতি। ফলে মানুষের জন্য দ্বীন-শরিয়াতের রুহ (মূল তত্ত্ব) বা উদ্দেশ্য বোঝাই যথেষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপর যা মনে চায়, তাই বলতে পারে, যেরকম পছন্দ ফাতওয়া দিতে পারে। আর এ সবগুলোকে আল্লাহর শরিয়াত ও দ্বীনের দিকে সম্বন্ধ করা হয়।

প্রতীক দেখে কোনো দল বা জামাতের সাথে আচরণ করার কুফল:

এ বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। তা হচ্ছে, আহলুল কিবলার সংজ্ঞা এবং তাবীলকারীদেরকে আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়:

আহলুল কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানগণ। আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ ও প্রথম যুগের আলিমদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষাগুলোর ভিত্তি ছিলো একমাত্র কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ। আর এর (এই পরিভাষাগুলো গঠনের) কারণ ছিলো তারা আপ্রাণভাবে চাইতেন, তাওহিদি মুসলমানদের জন্য ওহির নিরাপদ উৎস থেকে একটি ইলমি অবকাঠামো তৈরি হোক; এছাড়া, যেহেতু আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে শরঈ শব্দসমূহের প্রমাণকেই সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তা হয় যেকোনো ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

'আহলুল কিবলা' পরিভাষাটি হাকিকত বা মূলতত্ত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ইমামগণ তাঁদের কথাবার্তা ও লেখনীতে ব্যবহার করতেন। তাবিয়ীগণ ও তাঁদের পরবর্তীগণ এই শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন:

১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (রহ.) বলেন-

لا نعلم أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثماً

"আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা বা তাঁদের পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের মাঝে এমন কাউকে জানি না, যিনি গুনাহ মনে করে কোনো আহলুল কিবলার জাযানা পড়া ছেড়ে দিয়েছেন"।

২. ইমাম নাখয়ি (রহ.) বলেন:

لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة

"তাঁরা কোনো আহলুল কিবলার জানাযা পড়তে বারণ করতেন না"।

৩. ইমাম আতা ইবনু আবি রাবাহ বলেন-

صل على من صلى إلى قبلتك

"যে তোমার কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়ে, তুমি তারই জানাযা পড়তে পার"।

৪. ইমাম আবু ইসহাক আলফাযারি (রহ.) বলেন-

سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا)، وعن الشافعي وأحمد اسحق وأبي ثور وأبي عبيدة مثله

"আমি আওযায়ি ও সুফিয়ান সাওরিকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো আহলুল কিবলা চাই সে যেমন আমলই করুক, তার জানাযা পড়া কি

ছেড়ে দিতে হবে? তিনি বললেন, না। ইমাম শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর ও আবু উবায়দা থেকেও এমন কথাই বর্ণিত আছে”[4]।

ইমামদের এ কথাটির—‘চাই যেমন আমলই করুক না কেন’—উদ্দেশ্য হলো কুফরি আমল ব্যতীত। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেন-

يقول الله تعالى:... من لقيني بقراب الأرض خطيئة لايشرك بي شيءا لقيته بقرابها مغفرة

“আল্লাহ তাআলা বলেন—..যে দুনিয়া সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, আমি তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করি।” [5]

শুধু তাই নয়, সাহাবাদের কানেও এই (আহলুল কিবলা) উপাধিটি পৌঁছেছে। যেমন, সুলাইমান ইবনু কাইস আল-ইয়াশকারি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন: তাগুতরা কি আহলুল কিবলার মাঝে? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: আপনারা কি কোনো আহলুল কিবলাকে মুশরিক বলে ডাকতেন? তিনি বললেন: না। এ বর্ণনাগুলোতে আহলুল কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওইসব বিদআতি,

---

[4] শরহুস সুন্নাহ লিলআলকাঈ- হাদিস নাম্বার- ১৯৬৮, ২০১৮, ২০২৩ সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

[5] মুসলিম শরীফ, হযরত আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস।

যারা সালাত কায়েম করে এবং নিজেদের ইসলামের সাথে সম্বন্ধ করে।

আবু সুফিয়ান থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন-

قلت لجابر - بن عبد الله -: كنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم كفار؟ قال: لا، قلت: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال: نعم

“আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কি আহলুল কিবলাকে বলতেন, ‘তোমরা কাফির?’ তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তাহলে আপনারা কি আহলুল কিবলাকে বলতেন: তোমরা মুসলমান? তিনি বললেন: হাঁ।”[৬]

এমনিভাবে ইমামগণ ‘আহলুল কিবলা’ পরিভাষাটি প্রতিপক্ষকে জবাব দেয়ার জন্যও ব্যবহার করতেন। [৭]

প্রকৃতপক্ষে হাদিসের পরিভাষাগুলোকে মানতিকিদের সংজ্ঞার মতো جامع مانع কোনো সংজ্ঞা[৮] দিয়ে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যেমনটা আমরা ‘আহলুল কিবলা ও তার ব্যাপারে তাওয়িলকারীদের অবস্থা’ শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পাবো।

---

[৬] মুসলিম শরীফ- ২০০৯

[৭] এর উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম জুরজানি কৃত ‘আত তা’রিফাত’ এ। প্রবৃত্তিপূজারীদের সংজ্ঞায় তিনি বলেন- তারা (আহলে কিবলা) হচ্ছে ওই সকল লোক, যাদের আকায়েদ আহলে সুন্নাহর আকায়েদ নয়।

[৮] জামে’ ও মানে’ একটি আরবি পরিভাষা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন একটি সংজ্ঞা যা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বিষয়কে একীভূত করে, এবং সংজ্ঞা বহির্ভূত বিষয়গুলোকে সংজ্ঞাতে ঢুকে যেতে বাঁধা প্রদান করে।

মূলত কিবলা বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, সাধারণভাবে সালাতই হচ্ছে ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত প্রতিটি গ্রুপ ও দলের মাঝে সমন্বয়কারী। এটাই এমন বিষয়, যার ব্যাপারে মুসলমানদের মতবিরোধ নেই। এছাড়া ভূমিকায় উল্লেখিত হাদিসটি দ্বারাও এটা বোঝা যায়।

এ কারণেই আবুল হাসান আশআরি বিভিন্ন দল ও জাতির ব্যাপারে তার লিখিত কিতাবের নাম রাখেন "ইসলামপন্থীদের বক্তব্যসমূহ এবং সালাত আদায়কারীদের মতবিরোধ"। এই শিরোনাম তার অবস্থান প্রকাশ করে দেয়, এর আলোচনা সামনে আসবে।

বিদআতিদের জবাব দেয়ার জন্য এই (আহলুল কিবলা) পরিভাষাটি সৃষ্টি হয়েছে।কারণ, মুরজিয়া ছাড়া যেকোনো দলের তুলনায় আহলুস সুন্নাহর কাছে এর অর্থটা ব্যাপক। প্রত্যেক বিদআতি দলই ইসলামকে শুধু নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং তাদের বিরোধীদের ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-ই হলো সবার চেয়ে হৃদয়বান ও দয়াশীল।

ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত যেকোনো বিদআতি দলের সাথে আহলুস সুন্নাহর মতবিরোধগুলো চার প্রকারের মাঝে সীমাবদ্ধ:

১. কুফরি বিদআতে লিপ্ত তাবীলকারীরা আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য হবে কি না?

২. অবাধ্য ও গুনাহগাররা আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য হবে কি না?

৩. আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতাকারী বিদআতিরা আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য হবে কি না?

৪. পরিণতি বা অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করা এবং যাকে তার কথার অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করা হয়েছে, ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, সে আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য হবে কি না?

পরিণতির ভিত্তিতে তাকফির করার অর্থ হলো: তারা স্পষ্টভাবে কুফরি কথা বলেনি। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে এমন কথা বলেছে, যা দ্বারা কুফরি আবশ্যক হয়, তবে তারা সেই আবশ্যক হওয়াকে মানে না। আমি দেখেছি, আসলে বিরোধী মানেই ব্যাখ্যাকারী এবং উভয় পরিভাষা একটি অর্থই বোঝায়। তাই আমি উভয়টির সাথে সম্পর্কিত হাদিসগুলো একই অধ্যায়ে জমা করেছি।আর তাবীলকারীদের তাকফির করার একটি প্রকার হলো: অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করা। তাই যখন মূলের অর্থটি নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন তার প্রকারের অর্থও নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

ফাসিকদের আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে এখানে আমরা আলোচনা করবো না, কারণ এটা সবার কাছে প্রসিদ্ধ বিষয়। যদিও বর্তমানে এক্ষেত্রেও আহলুস সুন্নাহর প্রতিপক্ষ বিদ্যমান। যেমন,

ইবাজিয়াহ[৯]। ব্যাপক উপকারের দিক বিবেচনা করে আমি এ বিষয়টি দিয়ে আলোচনা শুরু করবো যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ কীভাবে মুসলিম হয়? কীভাবে তার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করা হবে? হুকুমের সম্পর্ক তো হলো বাস্তবতার সাথে। একমাত্র আল্লাহই তাওফিকদাতা। একজন মানুষ কীভাবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হয়?

মানুষ মুসলিম হয় তাওহিদের মাধ্যমে। তাওহিদকেই আরেক নামে ব্যক্ত করা হয়-কালিমায়ে তাইয়িবাহ বলে। لا إله إلا الله محمد رسول الله —আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এটা হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে আবশ্যক করে নেয়া চুক্তি। এর মর্মকথা হলো: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সে কারও ইবাদত করবে না এবং শুধু তাঁর বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ীই ইবাদত করবে।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

فإن التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار؛ وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به

[৯] ইবাজিয়্যাহ, প্রাচীন খারেজীদের একটি ফিরকা, তবে এরা কট্টর খারেজী নয়, বনী মুররাহ গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে ইবাজ আত তামিমিকে এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

“তাওহিদই হলো ইমানের ভিত্তি। এটাই জান্নাতি ও জাহান্নামিদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বাণী। এটাই জান্নাতের মূল চাবি। এটা ছাড়া কারও ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না।”[১০]

তিনি আরো বলেন:

دين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلهاً آخر... والأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله

“ইসলাম ধর্ম দুটো ভিত্তির ওপর স্থাপিত—এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।প্রথমটি হলো আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য বানাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তিনি তাঁর রাসুলের জবানে যেভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন, আমরা সেভাবেই তার ইবাদত করবো”।[১১]

তিনি ‘আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলা’ নামক কিতাবে বলেন:

دين الله هو الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده لايشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله

“ইসলাম ধর্ম দুটো ভিত্তির ওপর স্থাপিত, এক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা ছাড়া এককভাবে তাঁর ইবাদত করা; দুই. তিনি তাঁর

---

[১০] মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৪/২৩৫

[১১] মাজমুউল ফাতাওয়া-১/৩১০

রাসুলের ভাষায় যেভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেভাবেই ইবাদত করা। এ দুটো বিষয়ই আমাদের এই কথার তাৎপর্য—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল"।[১২]

আবশ্যক করে নেয়া চুক্তি বলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আবশ্যক করে নেয়া বুঝায়। কারণ, এখানে আমাদের আলোচনা হলো প্রকৃত ইসলাম নিয়ে। যার অর্থ হলো:

এক. এই কালিমাটির অর্থ জানা। সুতরাং যে তার সাধারণ অর্থ জানা ছাড়া শুধু এটা মুখে উচ্চারণ করবে, সে মুসলিম হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فاعلم أنه لا إله إلا الله

"তাই জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"[১৩]

আরেক স্থানে বলেন:

إلا من شهد بالحق

"তবে যে সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।"[১৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[১২] আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলা-১৬২ পৃষ্ঠা

[১৩] সুরা মুহাম্মাদ-১৯

[১৪] সুরা জুখরুফ- ৮৬

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة

“যে এমতাবস্থায় মারা যায় যে, সে জানে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[১৫]

দুই. সততা ও আন্তরিক একনিষ্ঠতা: সুতরাং যে এটা মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু সে এ ব্যাপারে সন্দেহকারী, অন্তরিক নয়, তাকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে না। যদিও বাহ্যিকভাবে মুসলিম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

“আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামের ওপর হারাম করেছেন, যে বলে—আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আর এর দ্বারা শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই তার উদ্দেশ্য থাকে”।[১৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار

---

[১৫] মুসলিম শরীফ, ১/৪১, মুসনাদে আহমাদ-৬৯২৬

[১৬] বুখারি শরীফ- ১/১০৯

"যে ব্যক্তি সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে সাক্ষ্য দিল 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল', আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন"[17]

তিন. আনুগত্য করা ও মেনে নেয়া।তাই যেমনিভাবে এ কথাটির অর্থ হলো বান্দা কর্তৃক আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়া, তেমনিভাবে এর অর্থ এটাও যে, বান্দা তার উপাস্যের আদেশগুলো মেনে নেবে, তাঁর সংবাদগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করবে।যেকোনো একটি আদেশ বা সংবাদকে যেকোনো ধরনের প্রত্যাখ্যান করা মানে এই চুক্তি ভঙ্গ করা।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) 'আল ইকতিযা'য় বলেন—

والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن

أ) تصديقه في كل ما أخبر

ب) طاعته في كل ما أمر

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর রাসুল বলে সাক্ষ্য দেয়ার মাঝে দুটো বিষয় নিহিত আছে:

১. তাঁর সব সংবাদের ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করা।

২. তাঁর সব আদেশের মাঝে তার আনুগত্য করা"।

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

---

[17] বুখারি ও মুসলিম শরীফ

ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرارفقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً

"যে সিরাত ও বিশুদ্ধ ইতিহাসের কিতাবসমূহের মাঝে এ বিষয়টা চিন্তা করবে যে: অনেক আহলুল কিতাব ও মুশরিক রাসুলুল্লাহ (সা.) এর রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাকে সত্য বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এই সাক্ষ্য তাদেরকে ইসলামের ভেতর দাখিল করেনি.. সে বুঝতে পারবে যে, ইসলাম এরচেয়ে ভিন্ন জিনিস। ইসলাম শুধু জানা বা জানা ও স্বীকৃতি দেয়ার নাম নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে জানা, স্বীকার করা এবং ভেতর-বাইরে উভয় দিক থেকে তার ইবাদতকে আবশ্যক করে নেয়া ও তার দ্বীনের বিধানগুলোকে মেনে নেয়া।"[১৮]

ইবনু হাজার (রহ.) বলেন:

إن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام

"কাফির নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি দিলেই ইসলামে প্রবেশ করে ফেলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের বিধানগুলো নিজের ওপর আবশ্যক করে না নেবে।"[১৯]

[১৮] যাদুল মাআদ-৩/৪২

[১৯] ফাতহুল বারী- ৭/৬৯৭

এখানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করতে চাই—আমল কবুল করা মানেই কার্যত আমল করা নয়, আমল কবুল করা ইসলামের জন্য শর্ত, এটা ছাড়া ইসলাম বিশুদ্ধ হবে না; কিন্তু কার্যত আমল করার ব্যাপারে কথা রয়েছে। কারণ, কিছু আমলকে ঈমানের জন্য শর্ত বলে গণ্য করা হয় আর কিছু আমলকে ঈমানের দাবি বা কর্তব্য গণ্য করা হয়। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা, এমনিভাবে বিশুদ্ধমতে সালাত কায়েম করা ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। পক্ষান্তরে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, প্রতিবেশির প্রতি দয়া করা, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে বাঁধা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো কবুল করে নেয়া কারও ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।কিন্তু এগুলো কার্যত আমলে পরিণত করা ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা, যা পালন করা কর্তব্য (অর্থাৎ ঈমানের শর্ত নয়)।এখানে আমাদের আলোচনা হলো প্রকৃত ইমান নিয়ে। পক্ষান্তরে বাহ্যিকভাবে একজন মানুষের ওপর কীভাবে ইসলামের হুকুম আরোপ করা হবে, সেটা পরের বিষয়।

একজন ব্যক্তির উপর ইসলামের হুকুম কিভাবে দেওয়া হবে?

বলা বাহুল্য যে, হুকুম হয় প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে। সাধারণত এটাই ভেতরগত ও প্রকৃত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু কিছু কিছু পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রম, যেমন বলপ্রয়োগের অবস্থা ও মুনাফিকের

অবস্থা। প্রকাশ্য যে অবস্থার ভিত্তিতে মানুষের ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করা হয়, তা জানা যায় তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে:

১. সুস্পষ্ট বর্ণনা।

২. প্রমাণ।

৩. প্রাসঙ্গিকতা বা সংশ্লিষ্টতা।

১. সুস্পষ্ট বর্ণনা:

এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো: যেমন কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে তাইয়িবা উচ্চারণ করল—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি মুখে এই কথাটি উচ্চারণ করল, তখন তার ওপর ইসলামের হুকুম দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة

“হে ইমানদারগণ! যখণ তোমরা আল্লাহর পথে সফর করো, তখন তোমরা যাচাই করো। কেউ তোমাদের দিকে সালাম পেশ করা সত্ত্বেও পার্থিব জীবনের সম্পদের কামনায় তাকে বলে দিও না—তুমি মুমিন নও। আল্লাহর কাছে অনেক গনিমত রয়েছে।”[২০]

[২০] সুরা নিসা-৯৪

ইবনু জারির (রহ.) বলেন:

هذه الآية نزلت في سبب قتيل قتلتة سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال: إني مسلم، أو بعدما شهد شهادة الحق، او بعدما سلم عليهم لغنيمة كانت معه، أو غير ذلك من ملكه فأخذوه منه... وذكر حديث أسامة رضي الله عنه وقتله الرجل بعدما أسلم

“এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত একটি বাহিনী জনৈক ব্যক্তিকে গনিমতের জন্য হত্যা করে ফেলল; অথচ লোকটি বলেছিলো—আমি মুসলিম। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিলো কিংবা তাঁদেরকে সালাম দিয়েছিলো।তারা তার সম্পদ গনিমত হিসাবে নিয়ে নেয়.. এরপর ইবনু জারির (রহ.) উসামা (রা.) এর হাদিস এবং জনৈক ব্যক্তি ইসলাম পেশ করার পরও তাকে হত্যা করে ফেলার ঘটনা উল্লেখ করেন”

সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করে, কেউ ইসলাম প্রকাশ করলে, অর্থাৎ ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করলে বা মুসলিমদের রীতিতে অভিবাদন করলে, তার প্রতি নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

“আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকি, যাবৎ না তারা সাক্ষ্য দেয়—لا إله إلا الله—আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।তারা যখন এটা বলবে, তখন আমার কাছ থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে। তবে তার হকের কথা ভিন্ন।” [২১]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى

“যে বলল—لا إله إلا الله—আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয়, তাদের অস্বীকার করল, সে তার সম্পদ ও জীবন হারাম করে নিল। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।” [২২]

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেন:

النص هو أن يأتي بالشهادتين أو يأتي بهما مع التبري مما هو عليه صريحاً

“স্পষ্ট বর্ণনা হলো, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা অথবা বর্তমানে সে যে আকিদার ওপর আছে তা থেকে স্পষ্টভাবে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার পর সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা”[২৩]।

---

[২১] বুখারি ও মুসলিম

[২২] মুসলিম শরীফ

[২৩] বাদায়েউল ঈমান- ১৩৫

এখানে অনেকগুলো মাসআলা আছে, কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা এখন সেগুলোর বিশ্লেষণে যাবো না। কারণ সেই বিশ্লেষণ এখানে উদ্দিষ্ট নয়। একটি মাসআলা হলো—যখন কারও ব্যাপারে জানা যায়, সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে সে কালিমাটি উচ্চারণ করেছে; স্বীকারোক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে এটা ইসলাম গ্রহণ হিসাবে ধর্তব্য হবে না।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

وأيضاً فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: "نشهد إنك رسول"، ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله، قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من اليهود، فعلم أن مجرد العلم والإخبار ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للإلتزام والإنقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم

“আরো প্রমাণ হলো, ইহুদিদের একটি দল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলল, “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি রাসুল।’ কিন্তু এতে তারা মুসলিম হয়নি। তারা তাদের মনের বিষয়টা অবগত করানোর জন্য এটা বলেছিলো। অর্থাৎ আমরা জানি, নিশ্চতভাবে জানি, আপনি আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তাহলে তোমরা আমার

অনুসরণ করছো না কেন?" তারা বলল, আমরা ইহুদিদের কাছ থেকে আশঙ্কা করছি।" "[২৪]

তাহলে বোঝা গেল, শুধু জানা ও সংবাদ দেয়া ইমান নয়, যতক্ষণ না নতুন করে ইমান আনয়নের কথা এমনভাবে বলবে যে, তার মাঝে বিধি-বিধান নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়া এবং আনুগত্য করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানোর বিষয়টিও থাকবে। এমনিভাবে যখন আগের দ্বীন থেকে সম্পর্কমুক্ত হবে না, তখনও ইমান সাব্যস্ত হবে না।

২. প্রমাণ:

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেন:

نحو أن يصلي كتابي أو واحد من أهل الشرك

"প্রমাণ হলো, যেমন কোনো আহলুল কিতাব বা মুশরিক সালাত পড়ছে"।[২৫]

অর্থাৎ কোনো লোক ইসলামের এমন কোনো প্রকাশ্য আমল করা, যেটা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা করে না। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সালাত এবং বাহ্যিক বেশভূষা। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামের হুকুম আরোপ করা হবে। আলিমগণ মুশরিকের ব্যাপারে মতবিরোধ

[২৪] ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে'- ৭/১০২

[২৫] ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে'- ৭/১০২

করেছেন যে, সে যখন ইসলামের কোনো কাজ করে, যেমন জামাতে সালাত পড়ল, তাহলে কি সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধরা হবে, নাকি ধরা হবে না? এখানে এই মাসআলার বিশদ আলোচনা বা যারা তার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করে তাদের দলিল পেশ করার প্রয়োজনবোধ করছি না।

৩. প্রাসঙ্গিকতা:

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেন:

فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل ويحكم بإسلامه تبعاً للدار أيضاً

"শিশুকে তার পিতা মাতার প্রাসঙ্গিকতার কারণে ইসলামের হুকুম দেয়া হবে। চাই সে বুঝমান হোক, বা না হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝমান হওয়ার পর নিজে নিজে ইসলাম গ্রহণ না করবে। এমনিভাবে দেশের প্রাসঙ্গিকতার কারণেও বাচ্চার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করা হয়"।[২৬]

তাই মানুষকে তার পিতামাতা ও দেশের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে ইসলামের হুকুম দেয়া হয়। এটি অনেক মাসআলার একটি, যা দেশ ও তার বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তিশীল। এখানে ইমাম শাওকানি ও শাইখ সিদ্দিক হাসান খানের মতের খণ্ডন রয়েছে। কারণ, তাঁরা ধারণা করেন, শরয়ি বিধি-বিধান সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিধি-বিধানের

[২৬] ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে'- ৭/১০২

কোনো ভূমিকা নেই এবং এই প্রকরণ থেকে কোনো ফায়দাই অর্জিত হয় না। আল্লাহ সবার প্রতি রহম করুন!

প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অবস্থা, তথা স্পষ্ট বর্ণনা, প্রমাণ বা প্রাসঙ্গিকতা দিয়ে কোনো মানুষের ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করার জন্য শর্ত রয়েছে। তা হচ্ছে লোকটি কোনো সর্বসম্মত ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ের সাথে জড়িত না থাকা। তবে এই মাসআলাটিও ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় দেখার ক্ষেত্রে তার প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন, অজ্ঞতা বা বলপ্রয়োগের অবস্থা। এতে ওইসব লোকের খণ্ডন রয়েছে, যারা উম্মতকে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিষয় দ্বারা তাকফির করে অথবা যারা মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের হুকুম আরোপ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে শিরক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নিশ্চিত হতে না পারে। শুধু এ কারণে যে, এটারও তো সম্ভাবনা আছে। এমনিভাবে এতে ওইসব লোকে মতেরও খণ্ডন রয়েছে, যারা সাধারণভাবে মসজিদের ইমামগণের পেছনে সালাত পড়া ছেড়ে দেয় এই আশঙ্কায় যে, হতে পারে তারা শিরকের সাথে যুক্ত। এসব মতের ভিত্তি হলো কতিপয় বিদআতি মূলনীতি, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, বিভিন্ন ধারণামূলক সম্ভাবনার ভিত্তিতে বাহ্যিক অবস্থার হুকুম বর্জন করা। এ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ আলোচনাটি সংকলন করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোল্লেখিত বাণী থেকে:

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا

"যে আমাদের সালাতের মতো সালাত পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে, তার জন্য সেই অধিকার সাব্যস্ত হবে, যা আমাদের জন্য সাব্যস্ত হয় এবং তার ওপর সেই দায়িত্বই বর্তাবে, যা আমাদের ওপর বর্তায়।'

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, অভ্যন্তরীণভাবেও শিরক থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামের জন্য শর্ত। কিন্তু এটা কারও ওপর বাহ্যিকভাবে ইসলামের হুকুম আরোপ করার জন্য শর্ত নয়। এর অর্থ হলো, কোনো মানুষের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা, সে কি শিরক থেকে সম্পর্কমুক্ত কি না, সে অভ্যন্তরীণভাবে তাগুতকে অস্বীকারকারী কি না.. ইসলামের হুকুম আরোপ করার জন্য এগুলো অনুসন্ধান করা আহলুস সুন্নাহর নীতি নয়। এটা হলো বিদআতিদের পথ। সুতরাং যে প্রকাশ্যে কোনো ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হয় এবং তার ব্যাপারে এমনটা প্রসিদ্ধিও না থাকে, তাকে এরকম পরীক্ষা করা জায়েয নেই যে, সে কি ভঙ্গকারী বিষয় থেকে মুক্ত কি না। এমনটা করা হলো বিদআতিদের কর্মপন্থা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তার পরবর্তীতে তাঁর সাহাবাদের থেকে কখনোই এমনটা প্রমাণিত নয়।

প্রথম যুগের বিদআতিদের থেকে এই বিদআতের উৎপত্তি হয়েছে।কিন্তু বর্তমানে এটা তাদের উত্তরসূরীদের মাঝে সবচেয়ে স্পষ্ট ও

প্রকাশ্যভাবে দেখা যাচ্ছে; যেমন আগাইলামা ও সীমালঙ্ঘনকারী দলসমূহ।

হুকুমের সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক:

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শাইবা (রহ.) কিতাবুল ইমানে বিশুদ্ধ সনদে তাবিয়ি আবু কিলাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، فقال: أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف:

مؤمن السريرة مؤمن العلانية.

وكافر السريرة كافر العلانية.

مؤمن العلانية كافر السريرة.

فقال عبد الله: اللهم نعم

"আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদকে সরাসরি প্রশ্নকারী দূত আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, "আমি আপনাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন, আল্লাহর রাসুলের যামানায় মানুষ তিন প্রকার ছিলো:

গোপনে ইমান আনয়নকারী এবং প্রকাশ্যেও ইমান আনয়নকারী।

গোপনে কুফরকারী এবং প্রকাশ্যেও কুফরকারী।

প্রকাশ্যে ইমান আনয়নকারী আর গোপনে কুফরকারী।"[২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বললেন: আল্লাহর শপথ! হাঁ।'

শাইখ সফর আল-হাওয়ালি বলেন:

فلم يكن في واقع الجيل الأول ولا في تصوره وجود المؤمن السريرة كافر العلانية، أي التارك للإيمان - أو من أتى بناقض - المؤمن بقلبه كما تزعم

[২৭] আলঈমান লিইবনি আবি শাইবা- ৩৫ পৃষ্ঠা

المرجئة، وانطلاقاً من هذا يقول الخطّابي: "قد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر

"সুতরাং প্রথম প্রজন্মের মাঝে বা তাঁদের কল্পনায় এমন কোনো মুমিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো না, যে ব্যক্তি গোপনে ইমানদার আর প্রকাশ্যে কুফরকারী অর্থাৎ ইমান বর্জনকারী; অথবা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু অন্তরে মুমিন, যেমনটা মুরজিয়াদের ধারণা"।[২৮]

ইমাম খাত্তাবি (রহ.) এর আলোকেই বলেন: মানুষ কখনো বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয়ে অভ্যন্তরীণভাবে কাফির হতে পারে, কিন্তু এমন হতে পারে না যে, অভ্যন্তরীণভাবে ইমানদার হয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুগত হবে না।

এর দ্বারা "الجامع في طلب العلم الشريف" এর লেখক শাইখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজের ভ্রান্তিও জানা যায়। কারণ তিনি চতুর্থ একটি প্রকার আবিস্কার করেছেন এবং সেটাকে সম্ভাবনাময় সাব্যস্ত করেছেন। তা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির ওপর কাফির বা মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দেয়া, কিন্তু আমাদের কাছে তার মুসলমান হওয়ারও সম্ভাবনা থাকা। তাগুতদের সাহায্যকারীদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

[২৮] যাহিরাতুল ইরজা- ২/৬৪৩

فحكمنا بكفرهم إنما هو على الظاهر ولا نقطع بكفرهم كممتنعين على الحقيقة لاحتمال قيام مانع من التكفير في حق بعضهم، مع التذكير بأنه لا يجب علينا البحث عن الموانع فالحكم عليهم إنما هو على الظاهر

"আমরা তাদেরকে কাফির বলে বাহ্যদৃষ্টিতে হুকুম আরোপ করলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা শরিয়াত প্রত্যাখ্যানকারী তাদের মতো অকাট্যভাবে কুফরের হুকুম আরোপ করতে পারছি না। কারণ, তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে তাকফিরের প্রতিবন্ধক কোনো বিষয় থাকতে পারে। তবে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে, প্রতিবন্ধকগুলো অনুসন্ধান করে দেখা আমাদের ওপর ওয়াজিব নয়। তাই তাদের ওপর হুকুমটি হলো বাহ্যিক অবস্থা হিসাবে।"[২৯]

শাইখ এখানে একটি বড় ভুলের মাঝে পড়েছেন। কারণ, কেউ অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। আর এটা তো বিদআতিদের কথা। সালাফদের থেকে এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না। তিনি এই ভুলের মাঝে পড়েন দুটো কারণে:

১. ইস্তেসনা (বিশেষ ব্যতিক্রম অবস্থা) এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে সাধারণ মূলনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা। এখানে তিনি যে মূলনীতিটি প্রয়োগ করেছেন, সেটা হলো বিধানগুলোকে বিভিন্ন অংশ

---

[২৯] যাহিরাতুল ইরজা- ২/৬১৬

আকারে ভাগ করা; অথচ আমি দেখেছি, এই মূলনীতির ব্যতিক্রমও আছে।

২. যুদ্ধের প্রকারের ব্যাপারে ইমামদের কথাগুলোকে তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর হুকুম আরোপের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। কারণ, অনেক সময় কোনো কওমের সাথে যুদ্ধ করা হয় মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে। আমরা তাদেরকে ধর্মত্যাগীদের দল বলে উল্লেখ করি, কিন্তু তাদের একেক জন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মুরতাদ বলি না। কারণ তাদের কারও কারও মাঝে প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়। ফলে শুধু প্রতিবন্ধক থাকার সম্ভাবনার ওপরই আমল করতে হয় এবং একেই গুরুত্ব দিতে হয়। তিনি এখানে প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, বরং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই প্রবল। সুতরাং এর ওপর আমল করা আবশ্যক।

শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) বলেন,

لا يقال إنه مجرد مجامعة ومساكنة المشرك يكون كافراً، بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهاً فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر

“এটা বলা যাবে না যে, শুধু মুশরিকের সাথে বসবাস ও মেলামেশা করলেই কাফির হয়ে যাবে, বরং উদ্দেশ্য হলো, মুশরিকদের থেকে বের হতে অক্ষম হয়, আর মুশরিকরা তাকেও জোর করে নিজেদের

সাথে যুদ্ধে বের করে নিয়ে আসে, তাহলে কুফর নয় বরং হত্যা ও সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার বিধান কাফিরদের বিধানের মতোই।"[৩০]

তাই শাইখ আব্দুল কাদির (আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন, আমাদের ও তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন) ইমামদের যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞাত ব্যক্তির হুকুমও পুরো দলের হুকুমের মতো—এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হত্যা করা ও সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে; কুফরের ক্ষেত্রে নয়। শাইখ (রহ.) আব্দুল মাজিদ আশ-শাজলির কিতাব " حد الإسلام وحقيقة الإيمان" এর খণ্ডনের ক্ষেত্রে এ মাসআলায় সঠিক অবস্থানেই ছিলেন। কিন্তু এখানে এসে বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

শাইখের কিতাব "الجامع في طلب العلم الشريف" এর কয়েক জায়গায় বাড়াবাড়ি রয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করবো, যদিও কিতাবটির অনেকগুলো আলোচনার ব্যাপারেই ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিলো।

১. "الرسالة الليمانية" কিতাবের লেখক 'মুওয়ালাহ' তথা বন্ধুত্ব এর মর্ম বুঝতে যে ভুল করেছেন, তার ব্যাপারে তার ওযর গ্রহণ করা।

২. মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এক প্রকারই বলে উল্লেখ করা, যার একমাত্র হুকুম হচ্ছে বড় কুফর।

---

[৩০] মাজমুয়া আররাসায়েল ওয়ালমাসায়েল- ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা।

৩. ইসলামের জন্য কাজ করে, এমন কিছু দলের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন যে, তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪. ব্যক্তিগত বিভিন্ন হকের ক্ষেত্রে নিজের বিরোধীদের মুনাফিক ও পথভ্রষ্ট বলে নাম করণ করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন।

৫. ব্যক্তিগত বিভিন্ন হকের ক্ষেত্রে নিজের বিরোধীদের ওপর এই হুকুম আরোপ করা যে, তাদের সাথেও হুবহু সেই রুপ যুদ্ধ করা আবশ্যক, যেমনিভাবে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক।

৬. পার্লামেন্ট সদস্য ও নির্বাচকদের কোনো শর্ত ব্যতীত ব্যাপকভাবে তাকফির করা, অথচ উক্ত শর্তগুলোকে গুরুত্বের স্থানে রাখা উচিত ছিলো।

এটা কিতাবের মান কমানো নয়। তবে আল্লাহ তো তার কিতাব ব্যতীত কোনো কিতাবকে পূর্ণতা দান করেননি।

তাবীলকারী ও বিরোধীরা আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত কি না:

এই মাসআলার মাঝে আহলুস সুন্নাহর মতটিই সবচেয়ে উত্তম এবং দয়া ও ইনসাফপূর্ণ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে দেখতে পারবে যে, এটাই হলো বিরোধীদের সাথে আচরণের সর্বোত্তম পন্থা। এ মাসআলাটি আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও বটে। কারণ, অধিকাংশ বিদআতি দলগুলোই এ মাআলায় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যেমনটা সামনে আসবে।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق، إذا إجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، أما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، إنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم

“যে তাবীলকারীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ করা, সে যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে, তাহলে তাকে কাফির বা ফাসেক বলে আখ্যা দেয়া যাবে না। আমলি মাসআলার ক্ষেত্রে এটা সবার কাছেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আকিদাহ্‌র মাসআলার ক্ষেত্রে অনেকেই ভুলকারীদের তাকফির করেছে, অথচ এমন কথা কোনো সাহাবি, তাবিয়ী বা ইমাম থেকে জানা যায় না। মূলত এটা হলো বিদআতিদের কথা, যারা বিদআত আবিস্কার করে আর তার বিরোধিতাকারীদের তাকফির করে। যেমন, খারিজি, মুতাযিলি ও জাহমিয়ারা। আর ইমামদের অনেক অনুসারীদের থেকেও এমনটা হয়েছে। যেমন, ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ (রহ.) ও অন্যান্য ইমামদের একদল শিষ্য থেকে এ ধরনের কথা বর্ণিত আছে।” [৩১]

---

[৩১] মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ-৫/ ২৩৯-২৪০

মূলত এ মাসআলাই কোনো ব্যক্তির ওপর সুন্নি বা বিদআতি হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পার্থক্য নির্ণয়কারী। যেমন, আহলুস সুন্নাহর অনেক আলিমদের মতে শুধু এ মাসআলার কারণেই খারিজিদের বিদআতি ও খারিজি বলে হুকুম আরোপ করা হয়। যারা হলো বিদআতিদের প্রধান। কারণ বিদআতিরা সাধারণত তাবীলকারী প্রতিপক্ষকে তাকফির করে, তাদের ওযর গ্রহণ করে না। আহলুস সুন্নাহ দাবিদার অনেক দলের মাঝেও এই বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে, যেমনটা বলেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.)।আর এই ছড়িয়ে পড়ার কারণ হলো, বিদআতিদের সাধারণভাবে তাকফির করার ক্ষেত্রে ইমামদের কথাগুলো না বোঝা।

যেমন যায়দিয়ারা তাদের কিতাবে স্পষ্টভাবে তাওয়িলকারীদের তাকফির করেছে। আল-হাদি তার "حدائق الأزهار" নামক কিতাবে লেখে—তাবীলকারীও মুরতাদের মতোই।

আল্লামা শাওকানি (রহ.) তার জবাবে লেখেন:

ههنا تسكب العبرات، وينـاح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة، ولا لقرآن، ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء، والسراب البقيعة

“এ স্থানে অশ্রু প্লাবিত হয় এবং দ্বীনের ব্যাপারে গোঁড়ামি অধিকাংশ মুসলমানের ওপর যে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে কাঁদতে হয়। অধিকাংশ মুসলমানের ওপর কুফরের অভিযোগ করা হয়েছে, না কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বয়ান বা প্রমাণের ভিত্তিতে; বরং যখনই সাম্প্রদায়িকতার ফুটন্ত পাতিলগুলো উত্তপ্ত হয়েছে এবং বিতাড়িত শয়তান মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পেরেছে, তখনই তাদের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের সবক দিয়েছে, যেগুলো বাতাসের উড়ন্ত ধুলোবালির বা শস্য-শ্যামল মরীচিকার মতো।”

আহলুস সুন্নাহর দাবিদার অনেক মুতাকাল্লিমও তাওয়িলকারীদের তাকফির করেছে।আবু মানসুর আল-বাগদাদি তার কিতাব উসূলুদিন-এ লেখেন:

المسألة الرابعة عشر من هذا الأصل؛ في أنكحة أهل الأهواء وذبائحهم ومواريثهم: أجمع أصحابنا على أنه لا يحل أكل ذبائحهم، وكيف نبيح ذبائح من لا يستبيح ذبائحنا، وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرمون ذبائحنا وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا... وأجمع أصحابنا على أن أهل الأهواء لا يرثون من أهل السنة

“এই মূলনীতির ১৪ নম্বর মাসআলা হলো বিদআতিদের কাছে বিয়ে দেয়া, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া এবং তাদের থেকে উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে:

আমাদের ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করা হালাল হবে না। যারা আমাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয মনে করে না, আমরা কীভাবে তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা জায়েয মনে করবো? অধিকাংশ মুতাযিলা ও খারিজিরা আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা হারাম বলে। তাই তাদের ব্যাপারে আমাদের কথা আরো বেশি কঠিন। আমাদের ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, বিদআতিরা আহলুস সুন্নাহর ওয়ারিস হবে না।”

এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেননি; তিনি বিদআতিদের দেশকে ধর্মত্যাগীদের দেশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

ومنهم من جعلهم مرتدين ولم يقبل الجزية، وفي إسترقاق أولادهم خلاف بين أصحابنا

“ইমামদের কেউ কেউ তাদের মুরতাদ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের জিযিয়া গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করেননি। তবে তাদের সন্তানদের গোলাম বানানোর ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।”

অপরদিকে রাফেযি শিয়ারা যে তাদের বিরোধীদের তাকফির করে, এটা তো সবার জানা ও প্রসিদ্ধ বিষয়ই। মাজলিসির ‘মাজালিসে আনওয়ার’ কিতাবে রয়েছে, তিনি বলেন,

عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم يكون حجة لنا عليهم؟ قال: لا تأتيهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله، ولعن مللهم المشركة

"হারুন ইবনু খারিজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি আবু আব্দুল্লাহকে বললাম, আমরা এসব বিরোধীদের কাছে যাই, তখন আমরা তাদের থেকে এমন কথা শুনি, যা আমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে দলিল হয়?!" [৩২]

আবু আব্দুল্লাহ বললেন—তাদের কাছে গিয়ে তাদের এসব কথা শুনবে না; আল্লাহ তাদের ওপর ও তাদের শিরকি আদর্শের ওপর অভিশম্পাত করুন! মাজলিসি এই শিরোনামে একটি অধ্যায় বানিয়েছেন- অধ্যায়: "বিরোধীদেরকে এবং আহলুস সুন্নাহকে তাকফির করা প্রসঙ্গ"। এমনিভাবে তারা যায়দিয়াদেরও তাকফির করে। মাজলিসি বলেন—

كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة

"আমাদের ইতিহাসের কিতাবগুলো এমন ইতিহাসে ভরপুর, যা যায়দিয়া ও তাদের মতাবলম্বী ফাতহিয়াহ ও ওয়াকিফিয়াহদের কাফির হওয়া প্রমাণ করে"।[৩৩]

---

[৩২] মাজালিসুল আনওয়ার-২/২১৬

[৩৩] মাজালিসুল আনওয়ার-৩৪/৩৭

ওয়াকিফিয়াহ হলো—যে ব্যক্তি আলী (রা.) এর খিলাফ, শরয়ী বর্ণনার আলোকে তাকে সমর্থন করা না করার ব্যাপারে যারা নীরবতা অবলম্বন করে।

মোটকথা, সাধারণভাবে এটা (তাবীলকারীদের তাকফির করা) বিদআতিদের নিদর্শন।

ইমাম শাফিয়ি (রহ.) বলেন,

أهل البدع إذا خالفته قال: كفرت، وأما السني فإذا خالفته قال: أخطأت

“আপনি কোনো বিদআতির বিরোধিতা করলে সে আপনাকে বলবে—তুমি কাফির হয়ে গেছো। আর কোনো সুন্নির বিরোধিতা করলে সে আপনাকে বলবে—তুমি ভুল করেছো।”

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

والخوارج تكفر أهل الجماعة وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق

“খারিজিরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে তাকফির করে। এমনিভাবে মুতাযিলা ও রাফিযিরাও তাদের বিরোধীদেরকে তাকফির করে। আর যাকে তাকফির করে না, তাকে ফাসেক সাব্যস্ত করে। এমনিভাবে অধিকাংশ বিদআতি নিজেরা একটা রায় আবিস্কার করে,

তারপর তার বিরোধীদের তাকফির করে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত হকের অনুসরণ করে, যা নিয়ে আগমন করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা তাঁদের বিরোধীদের তাকফির করে না। বস্তুত তারাই হকের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবগত এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বাধিক দয়াশীল।”[৩৪]

জ্ঞাতব্য:

আমরা এখানে বিভিন্ন দলের যে মতগুলো উল্লেখ করছি, তা হচ্ছে সংখ্যাধিক্য ও প্রাবল্যের ভিত্তিতে। অন্যথায় এসব বিদআতি দলের মাঝেও এমন লোক রয়েছে, যারা তাবীলকারীদের তাকফির না করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সাথে সহমত। তাই এই জ্ঞাতব্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূণ, যাতে আমরা ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার মাঝে ঢুকে না পড়ি এবং সব মানুষের সাথে প্রতীক দেখে আচরণ করতে না থাকি।

[৩৪] মিনহাজুস সুন্নাহ-৫/১৫৮

বিরোধী তাবীলকারীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর মতামত:

প্রথমে দুটো আবশ্যকীয় ভূমিকা:

প্রথম ভূমিকা:

মালিকি মাযহাবের ইমাম আবুল ওয়ালিদ আলবাজি বলেন:

والذي أذهب إليه أن الحق في واحد، وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق، ولكننا لم نكلف إصابته، وإنما كلفنا الإجتهاد في طلبه، فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم، ومن اجتهد فأصاب فقد أجر أجرين، أجر الإجتهاد وأجر الإصابة في الحق، ومن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجراً واحداً لاجتهاده ولم يأثم لخطئه... والدليل على ذلك قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين* ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 78 - 79]،

قال الحسن البصري رحمه الله: "حمد الله سليمان على إصابته وأثنى على داود لاجتهاده ولولا ذلك لضل الحكام

“আমার মত হলো, হক যেকোনো একটির মাঝে।যে সেটা ভিন্ন অন্য কোনো ফায়সালা করে, সে বেঠিক ফায়সালা করে। তবে আমাদের প্রকৃত সঠিক ফায়সালায় পৌঁছতে বাধ্য করা হয়নি, বরং আমাদের শুধু তা অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে তা অন্বেষণে পরিশ্রম করবে না, সে গুনাহগার হবে। যে চেষ্টা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে, তাকে দুটো প্রতিদান দেয়া হবে। পরিশ্রমের প্রতিদান এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রতিদান। আর যে ইজতিহাদ করে ভুল করে, তার ইজতিহাদ বা পরিশ্রমের জন্য তাকে একটি প্রতিদান দেয়া হবে।কিন্তু ভুলের জন্য কোনো গুনাহ হবে না। এর ওপর দলিল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণী-

{ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين* ففهمناها سليمان}

“এবং দাউদ ও সুলাইমানের কথা স্মরণ করুন, যখন তারা ফসলের ক্ষেতের ব্যাপারে ফায়সালা করছিলো, যখন কওমের বকরির পাল তাতে রাত্রিবেলা বিচরণ করেছিলো।আর আমি তাদের ফায়সালা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তখন আমি সুলাইমানকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।”

হাসান বসরি (রহ.) বলেন: সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারায় আল্লাহ সুলাইমানের প্রশংসা করেছেন আর দাউদ (আ.) এর প্রশংসা করেছেন তার ইজতিহাদের কারণে। যদি এমনটাই না হতো, তাহলে শাসকেরা সব বিপথগামী হয়ে যেতো”[৩৫]

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فالمجتهد المستدل - من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك - إذا اجتهد واستدل، فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافاً للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر، وقد لا يعلمه خلافاً للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ وسعه علم الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب

“সুতরাং কোনো দলিল-দেয়া মুজতাহিদ, চাই ইমাম, হাকিম, আলিম, গবেষক, তার্কিক, মুফতি বা অন্য যে কেউ হোক না কেন, যখন ইজতিহাদ করে এবং দলিল দেয় আর তাতে আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় করে, তাহলে এতটুকুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর দায়িত্ব ছিলো। সে আল্লাহর অনুগত ও সওয়াবের উপযুক্ত, যদি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ তাআলা কিছুতেই তাকে শাস্তি দেবেন না। পক্ষান্তরে জাবরিয়া জাহমিয়ারা ভিন্নমত পোষণ করে।

এমন ব্যক্তি এই অর্থে সঠিক যে, সে আল্লাহর অনুগত। কিন্তু কখনো প্রকৃত সত্য জানতে পারে আর কখনো জানতে পারে না। পক্ষান্তরে

[৩৫] ইহকামুল ফুসুল লিলইহকামিল উসুল- ৭০৮-৭০৯

মুতাযিলা ও কাদরিয়ারা ভিন্ন কথা বলে। তাদের মত হলো, যে ই পরিপূর্ণ সামর্থ ব্যয় করে, সে ই সত্য জানতে পারে। বস্তুত এটা ভ্রান্তকথা, যেমনটা পূর্বে আলোচিত হলো; বরং সঠিক কথা হলো, যে-ই পরিপূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে, সে-ই সওয়াবের উপযুক্ত হয়"।[৩৬]

ইবনু হাযাম (রহ.) বলেন:

لم يأمر الله تعالى قط الحاكم بإصابة الحق لأنه تكليف ما ليس في وسعه، إنما أمره بالحكم بالبينة العادلة عنده، أو اليمين أو الإقرار أو بعلمه، فما حكم به من ذلك في موضعه فقد حكم بيقين الحق، أصاب صاحب الحق أو لم يصب

"আল্লাহ তাআলা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার হুকুম দেননি আদৌ। কারণ এটা হয়ে যায় সামর্থ্যরে বাইরে দায়িত্ব। বরং আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন সুষ্পষ্ট ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ অথবা কসম অথবা স্বীকারোক্তি অথবা তার জানা অনুযায়ী ফায়সালা করতে। তাই যথাস্থানে এগুলোর যেকোনো একটি দিয়ে ফায়সালা করলেই নিশ্চিতভাবে সে হক ফায়সালাই করল। বাস্তবে সঠিক ফায়সালা হোক বা ভুল হোক"।[৩৭]

ইবনু হাযাম (রহ.) বলেন: "অথবা তার জানা অনুযায়ী" এটা গ্রহণযোগ্য মতের বিরোধী। কারণ বিচারক বা শাসকের জন্য নিজের জানা অনুযায়ী ফায়সালা করা জায়েয নেই। তবে জানার বিপরীতও ফায়সালা করা জায়েয নেই। মাসআলাটি ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলা।

---

[৩৬] মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৫/১১১

[৩৭] আলইহকাম ফি উসুলিল আহকাম- ৫/৭৭

তিনি আরো বলেন:

ليس كل من اجتهد واستدل ليتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً به أو فعل محظوراً

“বিষয়টি এমন নয় যে, যে-ই ইজতিহাদ করে এবং দলিল দেয়, সবাই হক জেনে ফেলে। তবে শাস্তির উপযুক্ত হয় একমাত্র সে-ই, যে কোনো আদিষ্ট কাজ পরিত্যাগ করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করে”।[৩৮]

দ্বিতীয় ভূমিকা:

এই উম্মাতের মুজতাহিদদের মাঝে ভুলকারীদে গুনাহ দেয়া হয় না। উসুলের (আকিদাহ্‌র) মাঝেও নয়, ফুরুয়ের (আহকামের) মাঝেও নয়।—উবাউদুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আম্বারি।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي - إمام أهل الظاهر - وغيرهم: لا يؤثمون مجتهداً مخطئاً لا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه.

وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لايكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما

[৩৮] মিনহাজুস সুন্নাহ- ৫/৯৮

هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلمو بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره

“এটাই সালাফ ও ফাতওয়ার ইমামদের মত। যেমন, ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ী, সাওরি এবং যাহিরিদের ইমাম দাউদ ইবনু আলী ও অন্যান্য ইমামগণ ভুলকারী মুজতাহিদকে গুনাহগার মনে করেন না। উসুলি মাসআলায়ও নয়, ফুরুয়ি মাসআলায়ও নয়। যেমনটা ইবনু হাযাম ও অন্যান্য ইমামগণ উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ি ও অন্যান্য ইমামগণ খাত্তাবিয়ারা বাদে বাকি বিদআতিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং তাদের পেছনে সালাত পড়া জায়েয মনে করেন; অথচ কাফিরের সাক্ষ্য মুসলিমের ওপর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তাদের পেছনে সালাত পড়া জায়েয হয় না। তারা বলেন—সাহাবা, তাবিয়িন ও আয়িম্মায়ে দ্বীন থেকে এ কথাই প্রসিদ্ধ যে, তারা মুজতাহিদদের ভুলকারীদের কাফির, ফাসেক বা গুনাহগার সাব্যস্ত করেন না; আমলি মাসআলায়ও নয়; আকিদাগত মাসআলায়ও নয়। তারা বলেন—(ইজতিহাদে ভুল করার ক্ষেত্রে) উসুলি আর ফুরুয়ি মাসআলার মাঝে পার্থক্য করা হলো মুতাকাল্লিমিন, মুতাযিলা, জাহমিয়া ও তাদের মতো বিদআতিদের কথা। পরবর্তীতে অনেকের কাছে

কথাটি ছড়িয়ে যায়। তারা নিজেদের উসুলে ফিকহের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে কথা বলেন, অথচ এর প্রকৃত ও গভীর জ্ঞান রাখেন না।” [৩৯]

শাইখ (রহ.) এর কথা “খাত্তাবিয়ারা বাদে” এটা এ কারণে নয় যে, তাদের প্রত্যেকে কাফির; বরং এই বিদআতি মাযহাবের একটি বুঝ হচ্ছে, তারা নিজেদের মাযহাবের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয মনে করে। তারপর শাইখ (রহ.) এই কথাটির তাবীল করেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন—পুরোটাই পার্থক্যকারীদের জবাবে।

তিনি আরো বলেন, এই (ইজতিহাদে ভুল করার) মাসআলায় উসুল আর ফুরুয়ের মাঝে পার্থক্যকারী কোনো মূলনীতি পাওয়া যায় না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, অধিক জানতে হলে ওই কিতাবের শরণাপন্ন হোন। এখানে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা না থাকলে আমি আলোচনা করতাম।

তাবীল এর অর্থ: অধ্যায় ও মাসআলাভেদে ‘তাবীল’ পরিভাষাটির অর্থ বিভিন্ন রকম হয়। এই পরিভাষাটি বোঝার ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য জানতে হবে। কারণ, এটা উসুলের কিতাবে একরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়, মুতাকাল্লিমিনের কাছে আরেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কুরআনে আরেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

‘তাওয়িল’ বা ‘তাআওওল’ দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এ দুটোর অর্থ হলো: একজন মুসলিম মুজতাহিদ কর্তৃক এমন

---

[৩৯] মিনহাজুস সুন্নাহ- ৫/৮৭

জিনিসকে দলিল মনে করা, যেটা আসলে দলিল নয়। এই সংজ্ঞার অর্থ হলো: একজন মুজতাহিদ, গবেষক বা আলিম আল্লাহ তাআলার কোনো হুকুম বা সংবাদ নিয়ে গবেষণা করবে অথবা তার দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী উদ্দেশ্য তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সঠিকটা বুঝতে পারবে না, বরং আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য বা হুকুমটি ভুল বুঝবে।

সুতরাং তখন সে মৌলিকভাবে ইসলামের বাণীর অনুগত; তা ভঙ্গকারী নয়। কিন্তু সে নিজের মাঝে আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়নের জন্য কালিমার যে দাবি ও বিধি-বিধানগুলো রয়েছে, তা অনুসন্ধান করে বের করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

আর এ ধরনের ভুলে পড়ার কতগুলো কারণ এখানে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো:

১. কোনো যৌক্তিক বা শরঈ মূলনীতি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা সঠিক হওয়ার ব্যাপারেও তার দৃঢ়তা। তাই বাকি মাসআলাগুলোকেও সে এর আলোকেই বোঝার চেষ্টা করেছে।

২. যয়িফ হাদিস গ্রহণ করে সহিহ হাদিস বর্জন করা।

৩. অন্ধ অনুসরণ।

৪. হুকুমটি শুধু একজন ব্যক্তি থেকে এভাবে জানা যে, এটাই সব আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত মত।

৫. ভাষাগত দুর্বলতার কারণে বা অনুপযুক্ত স্থানে বা ভুলভাবে মূলনীতি প্রয়োগের কারণে তাফসিরের মাঝে ভুল হওয়া।

এগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান কিছু কারণ। অন্যথায় কেউ কেউ তো এমনও আছে, যে তাবিল (তাওয়িল) এর অজুহাত দেখিয়ে শরিয়াত প্রত্যাখ্যান করা, কোনো আদেশ কবুল না করা বা কোনো শরঈ সংবাদ প্রত্যাখ্যান করার কৌশল করে। আমাদের তো প্রকাশ্য অবস্থা দেখেই হুকুম আরোপ করতে হবে। আর অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহর দায়িত্বে। তবে যদি আলামত বা দলিলের মাধ্যমে আমাদের সামনে তার কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আমরা তার মাধ্যমে হুকুম আরোপ করতে পারি।

তাবীলের বিভিন্ন স্তর:

ইবনু হাজার (রহ.) বলেন:

إن من أكفر المسلم نظر: فإن كان بغير تأويل استحق الذم، وربما كان هو الكافر، وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضاً ولا يصل إلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق، ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب، قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করতে চায়, সে প্রথমে চিন্তা করে দেখবে, যদি তার কুফর কোনো ধরনের তাওয়িল ছাড়া হয়, তাহলে সে নিন্দিত হবে এবং কখনো সে কাফিরও হতে পারে। আর যদি তাবীলের মাধ্যমে হয়, তাহলে যদি অযৌক্তিক তাবীল হয়, তাহলে সে নিন্দিত হবে, কিন্তু কুফর পর্যন্ত পৌঁছবে না; বরং তার কাছে তার ভুল স্পষ্ট করা হবে এবং যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। জমহুর আলিমদের মতে সে প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি উপযুক্ত ও সম্ভাব্য তাওয়িল হয়, তাহলে সে নিন্দিতও হবে না; বরং তার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে সে সঠিকের দিকে ফিরে আসে। আলিমগণ বলেন: প্রত্যেক তাওয়িলকারীই তার তাওয়িলের কারণে মাযুর (ওযরগ্রস্ত)।যদি তার তাওয়িলটি আরবি ভাষা হিসাবে যৌক্তিক হয় এবং ইলমের মাঝেও তার অবস্থান থাকে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না”।[৪০]

সুতরাং আমাদের বিরোধীরা তিন প্রকার:

- এমন বিরোধী, যারা তাওয়িলকারী নয়।
- অযৌক্তিক তাওয়িলকারী বিরোধী।
- যৌক্তিক তাওয়িলকারী বিরোধী।

[৪০] ফাতহুল বারী- ১২/৩০৪

আমলি মাসায়িল এবং মুসলমানদের ওপর তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে হাফিজ ইমাম ইবনু হাজার (রহ.) এগুলো উল্লেখ করেছেন।আমরা এ মাসআলাগুলো বিদআতিদের সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবো,

তাবীলকারীরাও অনুরূপ তিনভাবে বিভক্ত:

- কাফির তাওয়িলকারী।

- ওইসব তাওয়িলকারী, যারা আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত।এরা আবার দুই প্রকার:

ক. যাদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করে তাকফির করা হয় না, তবে শাস্তি দেয়া হয় এবং ভর্ৎসনা করা হয়।

খ. যাদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করে তাকফির করা হয় না, অনুরূপ কোনো ভর্ৎসনা বা শাস্তিও দেয়া হয় না; বরং তাদের ভুল স্পষ্ট করে দেয়া হয় এবং জানিয়ে দেয়া হয়।

তাকফির না করার ওযর গৃহিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

- আরবি ভাষায় তার দখল থাকা

- ইলমি ময়দানে তার দখল থাকা। অর্থাৎ তাওয়িলটা এমন হওয়া, যা ইলমি মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইবনু হাজার (রহ.) প্রথম শ্রেণির নামকরণ করেছেন: “তাওয়িলকারী বিরোধী”, আর আমরা তার নামকরণ করেছি ‘কাফির তাওয়িলকারী’,

এ দুটোর মাঝে শুধু শাব্দিক পার্থক্য। কারণ আহলুল কিবলার সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকেই মনে করে তার দলিল হচ্ছে কিতাব-সুন্নাহ, এমনকি বাতিনি ও কারামতিয়ারাও এমনটাই মনে করে। সুতরাং তাদের 'তাবীলকারী' বলে নামকরণ করাই অধিক বিশুদ্ধ।

এই প্রকরণটা শুধু সাধারণ ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর তা প্রয়োগ করার বিষয়টি হলো একটি বিচারিক বিষয়, যার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও পন্থা রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই মাসআলার ইলমি মূলনীতি বর্ণনা করা। কেননা, কারও ওপর নির্দিষ্ট করে তাকফিরের হুকুম আরোপের সাথে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে। এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসন্ধানের বিষয়, যার ভিত্তি হলো আলিম ও মুজতাহিদের ইতমিনান হাসিল হওয়া। এমন ব্যাপক বিষয় নয়, যা প্রত্যেকের জন্যই অবধারিত।

ইমাম শাতিবি (রহ.) বলেন:

إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصية نفسه، لأن اتباع الهوى أمر باطن لايعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي

"তবে এ বৈশিষ্ট্য জানার ভিত্তি হলো, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থা জানা। কেননা, প্রবৃত্তির অনুসরণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া

কেউই তা জানবে না, যদি সে নিজেকে চিনতে ভুল না করে। তবে যদি কোনো বাহ্যিক দলিল থাকে, তবে ভিন্ন কথা”।[৪১]

সংবাদ বা আদেশমূলক মাসআলাসমূহের মাঝে তাওয়িলকারীদের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

তাওয়িলকারীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর কতিপয় আলিমের বক্তব্য:

ইমাম যুহরি (রহ.) বলেন:

وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوه منزلة الجاهلية

“ফিতনা সংঘটিত হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য সাহাবা জীবিত। তখন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলেন যে, কুরআনের তাওয়িলের মাধ্যমে যে রক্ত প্রবাহিত করা হয় বা যে সম্পদ নেয়া হয়, তার কোনো জরিমানা নেই। তারা এটাকে জাহিলিয়ার পর্যায়ে রেখেছেন”।[৪২]

এটা হলো মুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলিমের যুদ্ধ। অর্থাৎ একজন মুসলিম আরেক মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করল। কিন্তু তা কুরআনের ভুল তাওয়িলের কারণে। তাহলে ভুলকারী জরিমানা দেবে না, যেমনিভাবে

---

[৪১] আলই'তিসাম-২/২২৫

[৪২] মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৪/৪৫৪

সঠিক করে থাকলে জরিমানা দিতে হতো না। তাবীলের কারণে গুনাহ ও জরিমানা বাদ হয়ে গেছে।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে হারামকে হালাল করে? তিনি উত্তরে বললেন:

المستحل لحرمة الله إذا كان مقيماً عليها باستحلال لها غير متأول لذلك ولا نازعاً عنه رأيت استتابته منها، فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع تركته، وإلا فاقتل لمثل الخمر بعينها والزنا وما أشبه هذا، فإن كان رجل على شيء من هذا على جهالة للإستحلال، ولا رداً لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عليه إذا غشي منها شيئاً

"আল্লাহর হারামকে যে হালাল করে, সে যদি এটা হালাল মনে করে করে, অর্থাৎ কুরআনের তাওয়িলর মাধ্যমে না করে, আর তা থেকে ফিরেও না আসে, তাহলে আমার মত হলো তার কাছ থেকে তাওবা চাওয়া হবে। যদি তাওবা করে এবং ফিরে আসে, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। যেমন হুবহু মদ, যিনা বা এ জাতীয় জিনিসগুলোকে হালাল মনে করলে করা হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, বরং অজ্ঞতাবশত হালাল মনে করে এগুলো সংঘটিত করে, তাহলে এগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হবে"।[৪৩]

---

[৪৩] আলজামে' লিলখাল্লাল- ২/৫০৫

এটা হলো তাবীলকারীর ওযর বিবেচনা করার ব্যাপারে আহমাদ (রহ.) এর বক্তব্য।

আর ইমাম আহমাদ (রহ.) এর কথা—এগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমি মনে করি, এটা আগে যুহরি (রহ.) এর যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিরোধী নয়। তাই ইমাম আহমাদ (রহ.) এর বক্তব্যটি হযরত ওমর (রা.) এর সেই কাজেরই সমর্থক, যা তিনি কুদামা ইবনু মাযউন (রা.) এর সাথে করেছেন। তিনি কুদামা (রা.)-কে মদপানের কারণে হদ প্রয়োগ করেছিলেন। হযরদ কুদামা আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাওয়িলবশত সেটাকে হালাল মনে করেছিলেন-

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

“যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা যা পান করেছে তার জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই।” [৪৪]

এটা তাওয়িলকারীদের বিভিন্ন স্তর হওয়া প্রমাণ করে, তথা কাউকে ওযর গ্রহণ করে হদ প্রয়োগ করা হবে, কারও ওপর দায়ভার আসবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই সতর্ক থাকুন।

[৪৪] সুরা মায়েদা- ৯৩

এ ধরনের মাসআলায় ব্যাপক সংজ্ঞা বা সাধারণ মূলনীতিগুলো দিয়ে কাজ করা থেকে আপনি সাবধান থাকুন। কারণ এ অধ্যায়ে এগুলোই সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ।

ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন:

قوله: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"، فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله

"রাসুলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস "আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে", এর মাঝেই একথার প্রমাণ রয়েছে যে, এ দলগুলোর কোনোটিই দ্বীন থেকে বহিস্কৃত নয়। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো দলকেই নিজের উম্মাত বলেছেন। এর মাঝেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তাবীলকারী ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে না, যদিও তাবীলে ভুল করে না কেন"।[৪৫]

ইসলামের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দলগুলোকে তাকফির না করার ক্ষেত্রে শাইখ (রহ.) এর এই কথাটি আহলুস সুন্নাহরও মত। চাই তারা খারিজি হোক, কাদিরয়া হোক, মুরজিয়া হোক বা রাফিযি হোক।

ইবনু কুদামা (রহ.) বলেন:

أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم – الخوارج - مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين إلى الله تعالى

---

[৪৫] আলবাইহাকি লিলসুনানিল কুবরা- ১০/২০৮

“অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামই তাদের (খারিজিদের) ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করেন না, যদিও তারা মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করে এবং একে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের কাজ হিসাবে করে”।[৪৬]

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه

“এমনিভাবে বাহাত্তর দলের সবগুলোই। তাদের মাঝে যে মুনাফিক হয়, সে অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরই। আর যে মুনাফিক হয় না; বরং ভেতরগতভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতিই বিশ্বাসী হয়, সে অভ্যন্তরীণভাবে কাফির হবে না। যদিও তাবীলে ভুল করে, চাই তা যে ভুলই করুক না কেন”।[৪৭]

আর “আমার উম্মাত বিভক্ত হবে..” হাদিসটি সহিহ। আহলুল ইলমদের একদল হাদিসটির অর্থ না বোঝার কারণে একে যয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, তাঁরা ধারণা করেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো একটি দল ছাড়া ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বাকি সব দলকে তাকফির করা, যেমনটা “আল-আওয়াসিম ওয়াল-কাওয়াসিম” কিতাবে

---

[৪৬] আলমুগনি- ১২/২৭৬

[৪৭] আলঈমান- ২০৬

ইমাম ইবনুল ওয়াযির করেছেন।এমনিভাবে ইমাম ইবনু হাযাম (রহ.) আলফসল নামক কিতাবে করেছেন। এটা আসলে হাদিসের অর্থ বোঝার ভুল। তবে তাঁরা (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) তাঁদের ইজতিহাদের কারণে মাযুর (ওযরগ্রস্ত)।

সুতরাং হাদিসটির হুকুম এটাই যে, বিদআতিরা পথভ্রষ্ট, সত্য থেকে বিচ্যুত এবং শাস্তির উপযুক্ত। আর আহলুস সুন্নাহর কাছে শাস্তির উপযুক্ত হওয়া আর শাস্তি কার্যকর করা এক জিনিস নয়, মুতাযিলা ও খারিজিরা যার বিরোধিতা করে থাকে। এ কারণে স্থায়ীভাবে তাদের জাহান্নামী হওয়ার বা কাফির হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। তবে অন্যান্য কথার মতো এটাও ব্যাপক নয়, বরং এরকম অনেক গ্রুপ আছে, যারা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু তারা কাফির, যদিও তারা তাবীল করে।

শাইখুল ইসলাম (রহ.) এখানে অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কথা বলছেন। যদিও বাহ্যিকভাবে উভয় দলই মুসলিম। কেউ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, উভয়ভাবে মুসলিম। আর কেউ বাহ্যিকভাবে মুসলিম, কিন্তু নিজেদের নিফাকি ও নাস্তিকতার কারণে অভ্যন্তরীণভাবে কাফির।

আর এখানে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা সত্ত্বেও বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ইসলামের হুকুম প্রয়োগ করা। তবে বাহ্যিক অবস্থার মাঝেই যদি আমাদের সামনে এমন আলামত প্রাকাশিত হয়ে

পড়ে, যা তার ওপর নাস্তিক ও মুলহিদের হুকুম আরোপ করার জন্য যথেষ্ট, তাহলে সেটা ধর্তব্য হবে, যেমনটা ইমাম শাতিবি (রহ.) এর বক্তব্যেও ছিলো।

ইমাম বাগাবি (রহ.) তাঁর শরহুস সুন্নাহ্য় হাসান ইবনু আলী (রা.) এর ফযিলত প্রসঙ্গে একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين) [رواه البخاري]، قال رحمه: (وفي هذا الحديث دليل على أن واحداً من الفريقين لم يخرج بما منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة، وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئاً في ذلك وعلى هذا اتفقوا على قبوله شهادة أهل البغي، ونفوذ قضاء قاضيهم

“হাদিস—“আমার এই (মেয়ের) সন্তান ভবিষ্যতে নেতা হবে এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটো বড় দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেবেন।” শাইখ (রহ.) বলেন: এই হাদিসের মাঝে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, দুই দলের কোনো দলই উক্ত ফিতনয় তাদের কোনো কথা বা কাজের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়নি। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে মুসলিম বলেছেন, যদিও একদল সঠিক ছিলো, আরেকদল ভুল ছিলো।

এমনভাবে প্রত্যেক তাবীলকারীই যে মাযহাব বা মত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে তার হুকুম এমনই, যদি তাবীলের কোনো ধরনের অবকাশ

থাকে, যদিও সে সেক্ষেত্রে ভুলকারী হয়। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম বিদ্রোহীদের সাক্ষ্য কবুল করা এবং তাদের কাজিদের ফায়সালা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন”।[৪৮]

ইমাম নববি (রহ.) বলেন-

المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع

“অধিকাংশ আলিম ও মুহাক্কিকের গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ কথা হলো, অপরাপর বিদআতিদের মতো খারিজিদেরও তাকফির করা হবে না।”[৪৯]

ইমাম নববি (রহ.) এর এই কথার মাঝে অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। উলামায়ে কিরাম খারিজিদের এই নামকরণ করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, তারা কাফির দল কি না? যেহেতু তাদের আকিদাহ্‌র ব্যাপারেও আলিমদের মাঝে বিরোধ আছে যে, তা কুফরি কি না। তাই, যদি তারা তাদের কোনো তাবীলের কারণে কুফরি বিদআতে অনুপ্রবেশ করে, তবে তারা আমাদের আলোচনার আওতাভুক্ত হবে। অন্যথায় এখানে তাদের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই, যেহেতু তখন তাদের দলকে কুফরি দল বলে নামকরণ করা হবে না।

[৪৮] শরহুস সুন্নাহ- ১৪/২২৬-২২৭

[৪৯] শারহু সাহিহি মুসলিম- ২/৫০

আর তার কথার মাঝে “অপরাপর বিদআতি দলের মতো” কথাটি ব্যাপক নয়। কারণ, তাদের মাঝে এমন গ্রুপও আছে, যাদের ব্যাপারে ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, তাদের অনেক কুফরি কথাবার্তা আছে। এজন্য তারা তাদের কুফরি দল বলে নামকরণ করেছেন। যদিও তাদের প্রতিজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হিফাজত করুন!

এমনিভাবে এ ব্যাপারে ইমামদের বর্ণনা অনেক বেশি। ইমাম ফাহল ইবনু হাযাম যহিরী (রহ.) এ ব্যাপারে কিতাবও লিখেছেন, যার নাম হচ্ছে: الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد

এই কিতাবটি এখনো ছাপা হয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর অন্যান্য কিতাবে এই কিতাবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। যেমন আল-ফাসল ও আল-ইহকামে। ইমাম যাহাবি (রহ.) সিয়ারে তার জীবনীতেও এটা উল্লেখ করেছেন।এটা দেখতে পারেন।

ইমাম ইবনুল ওয়াযির সানআনি (রহ.) তাঁর পূর্বোল্লেখিত “আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম” কিতাবে অনেক দলিল পেশ করে এই মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সেটা দেখতে পারেন।

আবুল হাসান আল-আশআরির কিতাবের শিরোনাম হলো “মাকালাতুল ইসলামিয়িন”। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য বুঝা গেছে। অর্থাৎ তিনি মতবিরোধকারীদেরকে মুসলিম বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি নিজ কথার মাঝে স্পষ্টভাবেও এটা বলেছেন।

যেমন ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন:

رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال: "أشهد علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف في العبارات".

قلت – الذهبي -: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم

“আমি আশআরীর একটি চমৎকার কথা পেলাম, যেটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কথাটি সুদৃঢ়, ইমাম বায়হাকি (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “আমি আবু হাযিম আল-আবদাওয়িকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইমাম যাহির ইবনু আহমাদ আল-আবদাওয়িকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “যখন বাগদাদে আমার বাড়িতে আবুল হাসান আল-আশআরির মৃত্যু সময় হয়ে ঘনিয়ে এল, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তার কাছে আসলাম। তিনি বললেন—তুমি সাক্ষী থাকো, আমি কোনো আহলুল কিবলাকে তাকফির করি না;

কারণ, সবার তো একই উপাস্য উদ্দেশ্য, এসব মতবিরোধ তো হলো কথার বিরোধ।" "

ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, "আমি বলি, এমনটাকেই আমরা দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করি। আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়া (রহ.)ও জীবনের শেষ সময়গুলোতে এ ধরনের কথাই বলতেন। তিনি বলতেন—মুমিন ছাড়া কেউ নিয়মিত ওযু করতে পারে না। সুতরাং যে নিয়মিত ওযু করে সালাত পড়ে, সে মুসলিম।"[৫০]

ইমাম আশআরির কথার মাঝে "সবার তো একই উপাস্য উদ্দেশ্য" বলার কারণ হলো, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে সে সময়ে মানুষের মাঝে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইখতিলাফ ছিলো।

ইমাম ইবনুল ওযির (রহ.) ইমাম যায়দি থেকে বর্ণনা করেন—যার নাম হলো আবু সাদ আলমুহসিন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাওয়াতিহ—অজ্ঞতা বা তাওয়িল থাকলে দ্বীনের বন্ধন ছিন্ন হবে না, তবে যদি জানা সত্ত্বেও করে, তবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে গাযালির কিতাব "কানুনুত তাওয়িল" নির্ভরযোগ্য নয়। এর অনেক আলোচনাই বিভ্রান্তিকর। তিনি প্রকৃতপক্ষে ফালসফিদের কিতাবসমূহ থেকে এ আলোচনা গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে ইবনু সিনার কিতাব 'আল-আযহুয়াহ' এর অনুসরণ করেছেন। তিনি তার

[৫০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ৫/৮৮

অনেক কিতাবেই তার দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তার এই কিতাবটি লিখেছেনই ইবনু সিনার মতো নাস্তিকদের ওযরগ্রস্ত প্রমাণ করার জন্য। এছাড়া ইবনু সিনা তার " مشكاة الأنوار وجواهر القرآن والمضنون به على غير أهله" (মিশকাতুল আনওয়ার ওয়া জাওয়াহিরুল কুরআন ওয়াল মুদান্নুনা বিহি আলা গাইরি আহলিহি) এর মতো কিতাবসমূহে যেসব বাতিনি তাবীল করেছেন, সেগুলোর বৈধতা প্রমাণের জন্য।

মোটকথা, আবু হামিদ আল-গাযালির কিতাবসমূহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এগুলোর কোনো আলোচনা সালাফের ধ্যান-ধারণার অনুকূল হলেই কেবল তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাঁর 'আস-সাবয়িনিয়্যাহ' নামক কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। তাই সেটা দেখে পারেন।

ইলমি পরিভাষায় القاعدة কাকে বলা হয়:

ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين:

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاً، فإنه منذ بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف؛ مؤمن به، وكافر به مظهر الكفر، ومنافق مستخفٍ بالكفر [70]، ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين...

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان منافقا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم.

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً، لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولامنافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أوعاصياً؛ وقد يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له خطأه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين.

والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام،

أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول

“এ অধ্যায়ে দুটো মূলনীতি উল্লেখ করার মাধ্যমে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায়। তা হলো:

এক. প্রকৃতপক্ষে কাফির, কিন্তু সালাত পড়ে। সে অবশ্যই মুনাফিক। কারণ, যখন থেকে মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করা হলো, তাঁর ওপর কুরআন নাযিল করা হলো এবং তিনি মদিনায় হিজরত করলেন, তখন থেকে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে: ১. তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, ২. তাকে অস্বীকারকারী, যে কুফর স্পষ্ট করেছে, ৩. মুনাফিক, যে কুফর গোপন করেছে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার শুরুর দিকে এই তিন শ্রেণির কথা আলোচনা করেছেন। চারটি আয়াত এনেছেন মুমিনদের গুণাগুণ বর্ণনায়, দুই আয়াত এনেছেন কাফিরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এবং দশের কিছু বেশি আয়াত এনেছেন মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়।

যখন বিষয়টা এমন প্রমাণিত হলো, তখন বিদআতিদের মাঝে কেউ হতে পারে মুনাফিক যিন্দিক। ফলে সে হবে কাফির। রাফিযি ও জাহমিয়াদের মাঝে এই শ্রেণির লোক বেশি আছে। কারণ, তাদের প্রধানরা ছিলো মুনাফিক, যিন্দিক। সর্বপ্রথম যে ‘রফজ’ তথা সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়ার সূচনা করেছে, সে ছিলো একজন মুনাফিক। এমনিভাবে ‘জাহমিয়াহ’ এর উৎপত্তি হলো ‘তাজাহ্হুম’ থেকে, যার

প্রকৃত অর্থ হলো নাস্তিকতা, কপটতা। এ কারণেই কারামাতিয়া, বাতিনিয়া, ফালাসিফা ও তাদের মতো মুনাফিকরা রাফিযি ও জাহমিয়াদের দিকে অধিক ঝুঁকতো, কারণ তাদের বৈশিষ্ট্য এদের বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি।

আবার বিদআতিদের মাঝে কেউ এমন হতে পারে, যার মাঝে ভেতরগত ও প্রকাশ্যভাবে ইমান থাকবে। কিন্তু তার মাঝে অজ্ঞতা ও বর্বরতা থাকার কারণে সুন্নাহ বুঝতে এমন ভুল করে। এই শ্রেণির বিদআতিরা কাফিরও নয়, মুনাফিকও নয়। তারপর কখনো তার মাঝে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম থাকে, ফলে ফাসিক ও অবাধ্য হয়। আর কখনো সে এমন ভুলকারী ও তাওয়িলকারীও হয়, যার ভুল ক্ষমাযোগ্য। আবার কখনো কখনো এর সাথে সাথে তার মাঝে এমন ইমান ও তাকওয়াও থাকতে পারে, যার কারণে স্বীয় ইমান ও তাকওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী তার সাথে আল্লাহর বন্ধুত্বও অর্জিত হতে পারে। এ হলো দুটো মূলনীতির একটি।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো: কখনো কথাটি কুফর হয়। যেমন, সালাত, যাকাত, রোজা, হজ্জ, ইত্যাদি ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা। এমনিভাবে যিনা, মদ, জুয়া, মাহরাম মহিলাদের বিয়ে করা ইত্যাদি কাজ হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা। কিন্তু যে উক্ত কথাটি বলেছে, তার কাছে আল্লাহর উক্ত আদেশ-নিষেধটি পৌঁছেনি; এ ধরনের অস্বীকারকারীকে তাকফির করা হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি নতুন

ইসলাম-গ্রহণকারী হয় অথবা এমন দূরপল্লিতে প্রতিপালিত হয়, যেখানে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো পৌঁছেনি, তাহলেও এমন অস্বীকারকারী তাকফির করা হবে না, যদি সে না জানে, এটা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে"।[৫১]

তাবীলকারী প্রসঙ্গ:

পূর্বোক্ত সব আলোচনাগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো, সবার কাছে ব্যাপক-প্রচলিত ইলমি মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা। সামনে আমাদের কাছে এটাও স্পষ্ট হবে যে, এ মূলনীতিগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এক ইমামের অবস্থা আরেক ইমাম থেকে ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকের কাছে প্রকাশিত আলামত ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলিত নিদর্শনের ভিত্তিতে তা হয়।

তাই এটা প্রমাণ করে যে, ওযর গৃহীত হওয়া সর্বসম্মত। কিন্তু (উদাহরণস্বরূপ) যায়দ নামক ব্যক্তির বা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির ওযর গ্রহণ করা আর আমর নামক ব্যক্তির বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির ওযর গ্রহণ না করার বিষয়টি হলো গবেষণা-সাপেক্ষ। এটা প্রত্যেকের বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল।

---

[৫১] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩/৩৫২-৩৫৪

ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: এ উম্মত কয় দলে বিভক্ত? তিনি বললেন:

الأصل أربع فرق: هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة...)، فقال له السائل: (لم أسمعك تذكر الجهمية؟!)، قال: (إنما سألتني عن فرق المسلمين

“মৌলিকভাবে চারটি দল—শিয়া, হারুরিয়াহ, কাদরিয়াহ ও মুরজিয়াহ। প্রশ্নকারী তাকে বলল: আপনি যে জাহমিয়াদের কথা উল্লেখ করলেন না?! তিনি উত্তর করলেন: তুমি তো আমাকে মুসলিমদের দলসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো”।[৫২]

এই উদ্ধৃতিটি থেকে দুটো বিষয় অর্জিত হয়: এক. বিদআতি গ্রুপগুলোকে তাকফির না করা।

দুই. তিনি জাহমিয়াদের তাদের থেকে বাদ দিয়েছেন এবং তাদের মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তবে “জাহিময়ারা মুসলিম নয়” উক্তিটির মাঝে যে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে, তা তো সবার জানা। কারণ, মুতাযিলাদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করা হয় না, অথচ আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে মুতাযিলারা জাহমিয়াদের মাযহাবেরই অনুসরণ করে, বরং ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামদের কতিপয় ছাত্র এও বলেছেন—জাহমিয়ারা বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত। সামনে কতিপয়

---

[৫২] আলইবানাহ আল কুবরাহ লিলআকবারী- ১/৩৭৭

বিদআতি গ্রুপকে তাকফির করা প্রসঙ্গে সালাফ ইমামদের শব্দগুলোর তাওয়িল প্রসঙ্গে এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

শিয়া:

'শিয়া' একটি প্রতীক, বেশ কয়েকটি গ্রুপই এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ইমামগণ প্রত্যেকটি গ্রুপকেই তাদের স্ব স্ব আকিদাহ্-বিশ্বাস ও তাদের ব্যাপারে তাদের জানাশোনা অনুযায়ী হুকুম আরোপ করেছেন। এসব গ্রুপগুলোর মাঝে রয়েছে:

১. ইমামিয়াহ ইসনা আশারিয়াহ:

অন্যান্য বিদআতি দলগুলোর মতো এটাও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপডেট হয়। তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রত্যেক ইমামেরই তাদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও বক্তব্য আছে। অর্থাৎ তাদের আকিদার ব্যাপারে; বিধি-বিধানের ব্যাপারে নয়।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এই গ্রুপ সম্বন্ধে বলেন,

ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلال شر منهم، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم، وهؤلاء الرافضة إما منافق أو جاهل، فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقاً أو جاهلاً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

"ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যতগুলো দল আছে, তাদের সবগুলোর মাঝেই বিদআত ও পথভ্রষ্টতা থাকা সত্ত্বেও এই দলটি থেকে নিকৃষ্ট

কেউ নয়। তাদের চেয়ে বড় মূর্খ, মিথ্যাবাদী, জালিম এবং কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতার অধিক নিকটবর্তী আর প্রকৃত ইমান থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থানকারী কেউ নয়। এ রাফিযিরা হয়তো মুনাফিক অথবা জাহেল-মূর্খ। সুতরাং এমন কোনো রাফিযি বা জাহমিয়া নেই, যে হয়তো মুনাফিক অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার ব্যাপারে জাহেল হবে না।"[৫৩]

তিনি এখানে তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা সত্ত্বেও আরেক স্থানে তাদের ব্যাপারে বলেন,

والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه

"বিশুদ্ধ মত হলো—যেসব কথাবার্তা তারা বলে, যেগুলোর ব্যাপারে জানা যায় যে, তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শবিরোধী—এগুলো কুফর। এমনিভাবে মুসলমানদের সাথে তাদের ওইসব আচরণ—যেগুলো কাফিরদের আচরণের মতো—এগুলোও কুফর। কিন্তু তাদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করা, তার ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার হুকুম আরোপ করা নির্ভর

[৫৩] মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৫/১৬০-১৬১

করবে তাকফিরের শর্তগুলো প্রমাণিত হওয়া এবং তার প্রতিবন্ধকগুলো না থাকার ওপর।' [৫৪]

তিনি এটা বলেছেন, অথচ ইমামগণ রাফিযিদেরকে কাফির গ্রুপ বলেও অভিহিত করেছেন।

ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন,

هما ملتان الجهمية والرافضة

"ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি বলেন—তারা দুটো জাতি, জাহমিয়া ও রাফিযি।"[৫৫]

বরং ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাদের ব্যাপারে নিফাকের সব গুণ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন—রাফিযিদের অবস্থা হলো মুনাফিকদের মতো।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কোনো দলের ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করা আর উক্ত দলের প্রত্যেকটি সদস্যদের ওপর নির্দিষ্টভাবে কুফরের হুকুম আরোপ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, সামনে বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

এমনিভাবে তাদের ইমামদের ওপর হুকুম আরোপ করা আর জনসাধারণের ওপর হুকুম আরোপ করার মাঝেও পার্থক্য রয়েছে।

[৫৪] মাজমুউল ফাতাওয়া-২৮/৫০০

[৫৫] খুলুকু আফআলিল ইবাদ লিলবুখারি- ১২৫ পৃষ্ঠা

যেমন, আগে এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর শাস্ত্রীয় মূলনীতি আলোচিত হয়েছে।

তবে কতিপয় সীমালঙ্ঘনকারী রাফিযিদের অবস্থাও দেখতে হবে, যারা কুরআন বিকৃত হওয়ার কথা বলে অথবা আল্লাহর ওপর কোনো সূচনা থাকার বিশ্বাস রাখে অথবা অধিকাংশ সাহাবিকে তাকফির করে, এসব মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ তাওয়িলকে কোনো ওযর হিসাবে গণ্য করেননি। এ কারণেই তারা বাতিনিয়াহ, ইসমাইলিয়াহ ও কারামতিয়াদের তাকফির করেছেন, যা সামনে আসবে।

সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কোনো দল বা ব্যক্তির ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করার জন্য দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি:

এক. সমকালীন গ্রুপগুলোর সাথে পূর্বপ্রতীকের আলোকে আচরণ করা যাবে না। কেননা, যুগের পরিবর্তন ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে তার অর্থ ও তাতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মাঝেও পরিবর্তন হচ্ছে।

দুই. তাকফিরের মাসআলায় দলের ওপর যে পদ্ধতিতে হুকুম আরোপ করা হয়, ব্যক্তির ওপর হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। সুতরাং ব্যক্তির ওপর হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে আলেম ও জাহেলের মাঝে এবং যার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর যার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

খ. গালি (সীমালঙ্ঘনাকারী) শিয়া।

তাদের মাঝেই রয়েছে কারামতিয়া ইসলাইলিয়া সম্প্রদায়। আলিমগণ তাদের দলীয়ভাবে এবং পৃথকভাবে তাকফির করেছেন এবং তাদের মুসলমানদের মাঝে গণ্য করতে নিষেধ করেছেন।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين واليهود والنصارى

“তাহলে কারামতিয়া বাতিনিদের অবস্থা কী হতে পারে, যাদের মুসলমান, ইহুদি, নাসারাসহ সব ধর্মের লোকেরা কাফির বলে!”[৫৬]

তিনি আরো বলেন—

لكن القرامطة أكفر من الإتحادية بكثير

“তবে কারামতিয়ারা ইত্তিহাদিদের চেয়েও জঘন্য কাফির”[৫৭]

ইত্তিহাদিরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হওয়ার কথা বলে। বস্তুত জালিমরা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

তিনি আরো বলেন,

[৫৬] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪১

[৫৭] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪৪

فإن الذي إبتدع الرفض كان منافقاً زنديقاً، وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، وكذلك رؤوس القرامطة والخرمية وأمثالهم لا ريب أنهم من أعظم المنافقين، وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم

“যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাফিযি আকিদাহ্‌র সূচনা করেছে, সে ছিলো একজন মুনাফিক, যিন্দিক। এমনিভাবে জাহমিয়া আকিদাহ্‌র সর্বপ্রথম সূচনা যে করেছে, সেও ছিলো একজন মুনাফিক। এমনিভাবে কারামতিয়া, খারমিয়া ও এ জাতীয় দলগুলোর সব প্রধানরাই নিঃসন্দেহ সবচেয়ে বড় মুনাফিক ছিলো। এদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।”[৫৮]

নুসাইরিয়া:

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين

“নুসাইরিয়া নামধারী এই সম্প্রদায় এবং কারামতিয়া বাতিনিদের সব শ্রেণি ইহুদি নাসারাদের চেয়ে জঘন্য কাফির; বরং অনেক মুশরিকদের

[৫৮] বুগিয়াতুল মুরতাদ- ২৪১ পৃষ্ঠা

চেয়েও জঘন্য কাফির।উম্মাতে মুহাম্মদির ওপর তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী কাফিরদের অনিষ্ট থেকেও বেশি।”[৫৯]

জেনে রাখুন, শাইখ (রহ.) এর উক্তি “তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী কাফিরদের অনিষ্ট থেকেও বেশি” থেকে তাকফিরের অর্থ বোঝা উচিত হবে না। কারণ, অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কারও অনিষ্ট কাফিরদের অনিষ্ট থেকে বড় হয়, অথচ সে কাফির নয়। যেমন, ইমাম গাযালি (রহ.) কিছু লোককে হত্যা করার ফযিলত উল্লেখ করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তাদের একজনকে হত্যা করা একশত কাফির হত্যা করার চেয়ে উত্তম। কিন্তু তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া ব্যাপারে থেমে গেছেন।

‘দারযিয়া’:

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وكفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم [85]، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم، وتسبى نسائهم، وتأخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقاتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم

“এসব লোকের কাফির হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই, বরং যে তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ

[৫৯] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪৯

করবে, সেও তাদের মত কাফির হবে। তারা আহলুল কিতাব বা মুশরিকদের পর্যায়েও নয়; বরং তারা পথভ্রষ্ট কাফির। তাই তাদের খাবার খাওয়া যাবে না, তাদের নারীদের বন্দি করা হবে এবং তাদের সম্পদ অধিগ্রহণ করা হবে। কারণ, তারা নাস্তিক ও মুরতাদ। তাদের তাওবা কবুল করা হবে না, বরং যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদের হত্যা করা হবে। তাদের কথার মতোই তাদের অভিশম্পাত করা হবে। প্রহরী, দারোয়ান বা রক্ষী হিসেবে তাদের ব্যবহার করা যাবে না। তাদের উলামা ও সৎকর্মশীলদেরও হত্যা করা হবে, যাতে তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে।"

এসব গ্রুপের মাঝে শাইখ (রহ.) এর পার্থক্য করা দেখুন:

আপনি দেখেছেন যে, শাইখ (রহ.) রাফিযিদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর রাফিযিরা হলো তাবীলকারী, অথচ কেউ কেউ তাদের ধর্মত্যাগী দল বলেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বাতিনি, নুসাইরি ও দারযিয়াদের তাওয়িলকে গ্রহণ করেননি, অথচ তারাও ইসলামের দাবিদার কতিপয় গ্রুপই।

এর কারণ রাফিযিদের তাবীলগুলো যদিও অযৌক্তিক, কিন্তু এটা একটা ওযর, যা তাদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করতে বাধা দেয়। তবে যদি সব শর্ত পাওয়া যায়, তবে তাকফির করা যায়। পক্ষান্তরে বাতিনিদের তাওয়িলগুলোর মাঝে তাদের পক্ষে কোনো

সামান্য দলিল বা দলিলের সন্দেহও নেই। আভিধানিক দিক থেকেও নয় আর ইলমের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তাদের দলিলগুলো থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তাদের তাওয়িলের দাবি মিথ্যা ও একটি কৌশল।

তারপর শাইখ (রহ.) উল্লেখ করেন যে, "রাফিযিরা বাতিনিদের সাথে যোগ দিয়েছে, অথচ তারা জানে না যে, ভেতরগতভাবে বাতিনিরা কী বলে। সুতরাং এমতাবস্থায় এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে তার অবস্থা অনুযায়ী হুকুম আরোপ করা হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

যারা ভবিষ্যতের ব্যাপারে আল্লাহর পূর্ব-ইলমকে অস্বীকার করে, আর যারা বান্দার কর্ম আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে, এ দুই গ্রুপের মাঝে উলামায়ে কিরাম পার্থক্য করেছেন:

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال

"কাদরিয়া, যারা আল্লাহর তাকদির ও ভবিষ্যতের ইলমকে অস্বীকার করে, উলামায়ে কিরাম তাদের তাকফির করেছেন, তবে যারা ইলম থাকাকে মানে, কিন্তু বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট হওয়াকে মানে না, উলামায়ে কিরাম তাদের তাকফির করেননি"।[৬০]

---

[৬০] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩/৩৫২

উভয় গ্রুপই তাবীলকারী। কিন্তু দুই বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, ইলম অস্বীকারকারীদের সংশয়টা একেবারেই দুর্বল। কারণ, আল্লাহর ইলম সাব্যস্তকারী বর্ণনাগুলো একেবারে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও বিস্তারিত। যার মাঝে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকার সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই এগুলোর ক্ষেত্রে তাবীল করার দাবির কোনো মূল্য নেই।

পক্ষান্তরে কাদরিয়াদের সংশয় এর চেয়ে ভিন্ন রকম। কারণ তারা বলে, মানুষ তার কাজগুলো সৃষ্টি করে। তাদের এই কথার পক্ষে অনেক যৌক্তিক সংশয় আছে। এমনিভাবে কিছু শরঈ বর্ণনার অর্থের মাঝেও তাদের তাবীলের কিছুটা সম্ভাবনা বিদ্যমান। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা উক্ত শরঈ বর্ণনাগুলোর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি।

ইবনু হাযেম (রহ.) বলেন:

وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلما، مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط... وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن، وطوائف كانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح وآخرون قالوا إن النبوة تكتسب بالعمل الصالح

“কখনো তুমি এমন লোককে মুসলিম বলে নামকরণ করো, যার ব্যাপারে সব ইসলামি ফেরকাগুলোর ঐকমত্য রয়েছে যে, সে সে মুসলিম নয়। যেমন, খারিজিদের কিছু কিছু গ্রুপ সীমালঙ্ঘন করে

বলে—সালাত হলো শুধু সকালে এক রাকাত, বিকালে এক রাকাত। তারা আরো বলে—সুরা ইউসুফ কুরআনের অংশ নয়।

আর কিছু কিছু গ্রুপ এমন রয়েছে, যারা আগে মুতাযিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তারপর সীমালঙ্ঘন করে আত্মা পুনর্জন্মের মতবাদ গ্রহণ করে। তারা আরো বলে—নেক আমল দ্বারা নবুওয়াত অর্জন করা যায়”।[৬১]

এই বক্তব্যটি সব গ্রুপগুলোর সাথে একরকম আচরণ করার বিভ্রান্তি প্রমাণ করে। এমনিভাবে, কেউ যখন নির্দিষ্ট একটি কথার মাঝে কোনো দল থেকে স্বতন্ত্র, তখন উক্ত দলের নামে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর হুকুম আরোপ করার ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়। এখানেই দেখতে পেলেন যে, অনেকগুলো দলের নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ইমামগণ তাকফির করেননি, কিন্তু ইবনু হাযম (র.) উক্ত দলগুলোকে দলীয়ভাবে তাকফির করেছেন। কারণ, তারা ওইসব কথা বলে, যেগুলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোর ক্ষেত্রে তাওয়িল গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ বিষয়টি সতর্কতার সাথে বুঝতে হবে। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হিফাজত করুন!

---

[৬১] আলফসল-২/১১৪

প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও বিদআতি গ্রুপগুলোকে তাকফির করা সংক্রান্ত ইমামদের উদ্ধৃতিগুলো:

বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে পূর্বসূরী ইমামদের অনেক বক্তব্য বর্ণিত আছে। কিন্তু অনেকেই তাদের এ কথাগুলো বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। কেউ এগুলোকে ছোট কুফর বলে ধরে নিয়েছে এবং তাদের তাকফিরের পরিপূর্ণ বিরোধী হয়েছে। আর কেউ এগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে। ফলে তাদের একেকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেও তাকফির করেছে। আর কেউ এর মাঝে পার্থক্য ও বিশ্লেষণ করেছে।

এ ধরনের বর্ণনাগুলোর কিছু নিচে দেয়া হলো:

১. কুরআন মাখলুক হওয়ার প্রবক্তাদেরকে তাকফির করা। যেমন, এ ধরনের একটি কথা ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেছেন—

من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر

"যে বলে কুরআন মাখলুক, আমাদের কাছে সে কাফির"।[৬২]

এমনিভাবে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রহ.) বলেন—

من قال مخلوق - أي القرآن - فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر

"যে বলে কুরআন মাখলুক, সে কাফির; এমনকি যে তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফির"[৬৩]

---

[৬২] আস সুন্নাহ- ১/১১২

২. জাহমিয়াদেরকে তাকফির করা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৩. রাফিযিদেরকে তাকফির করা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৪. কাদরিয়াদেরকে তাকফির করা।

৫. সাহাবিদের গালিদানকারীদের তাকফির করা।

বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে ইমামদের কিছু ব্যাপক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো:

১. হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى

"প্রবৃত্তি অনুসারীরা ইহুদি-খৃষ্টানদের পর্যায়ে"।

২. মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে: তিনি বলেন—

كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء

"পূর্ববর্তীগণ ধর্মত্যাগী ও কুফরে লিপ্তদেরকেই প্রবৃত্তির অনুসরণকারী মনে করতেন"।[৬৪]

ইমামদের কথাগুলো বোঝার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির হওয়ার ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

---

[৬৩] আস সুন্নাহ- ১/১১২

[৬৪] শারহু উসুলিল ই'তিকাদ লিলআলকাঈ- হাদিস নাম্বার- ২৩৩৩/২৩৪

والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإلحاد

“বিদআতি ও প্রবৃত্তি পূজারীদের তাকফির করার ব্যাপারে এবং তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। এমন কোনো ইমাম নেই, যার কাছ থেকে এ ব্যাপারে দুই রকমের বর্ণনা বিদ্যমান নেই; যেমন, মালেক, আহমাদ, শাফিয়ি ও অন্যান্য সবাই।

আর তাদের অনুসারীদের কেউ কেউ সব বিদআতিদের ব্যাপারেই এরকম মতবিরোধ ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কথা বর্ণনা করে থাকে। ফলে যাকেই তারা নির্দিষ্ট করে বিদআতি বলে মনে করে, তার ব্যাপারেই চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার হুকুম আরোপ করে। এর মাঝে যে কতটা বিভ্রান্তি আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

আর এর বিপরীতে আরেক দল মনে করে, বিদআতিদের কারও ব্যাপারেই কুফরের হুকুম আরোপ করা যাবে না, চাই তারা যতই

নাস্তিকতা করুক বা মুআত্তিলা ও মুলহিদীনদের আকিদাহ্ গ্রহণ করুক”।[৬৫]

তিনি বলেন,

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً [94]، فيتعارض عندهم الدليلان، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم من كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رآهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه

“এই মতবিরোধের কারণ হল দলিলসমূহের পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা। কারণ, তারা প্রথমে এমন দলিল দেখতে পান, যা তাদের ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করা আবশ্যক করে। কিন্তু তারপর ওইসব কথার প্রবক্তাদের এমন এমন সদস্যদেরকে দেখতে পান, যাদের মাঝে রয়েছে এমন ইমান, যার কারণে তারা কাফির হতে পারে না। মূল ব্যাপার হলো, ইমামদের বক্তব্যগুলোর মাঝে ব্যবহৃত ব্যাপক শব্দগুলো বোঝার ক্ষেত্রে তাদেরও সেই সমস্যাই হয়েছে, যেটা পূর্ববতীদের হয়েছিলো—শরিয়াত প্রণেতার বর্ণনাগুলোর মাঝে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দগুলো বোঝার ক্ষেত্রে। যখনই তাদের বলতে দেখেছে ‘যে এমনটা

---

[৬৫] মাজমুউল ফাতাওয়া- ৭/৬১৮-৬১৯

বলে, সে কাফির’, তখনই শ্রোতা মনে করেছে, এই শব্দ তো এমন কথার প্রবক্তা সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু তারা এটা চিন্তা করেনি যে, তাকফিরের জন্য অনেক শর্ত ও প্রতিবন্ধক রয়েছে, যা অনেক নির্দিষ্টের মাঝে অনুপস্থিত থাকে এবং ব্যাপক তাকফির নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করা আবশ্যক করে না। তবে যখন সব শর্ত পাওয়া যায় এবং কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তখন করা যায়। এ কথাগুলো এটাই স্পষ্ট করে যে, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য অধিকাংশ ইমামগণ, যারা এসব সাধারণ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারা এসব কথার প্রবক্তাদের অধিকাংশকেই নির্দিষ্ট করে তাকফির করেন না।” [৬৬]

এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ ইমামদের কথাগুলোকে ছোট কুফরের অর্থে প্রয়োগ করেছে, তারপর তাদের (বিদআতিদের) দলীয়ভাবে তাকফির করারও বিরোধিতা করেছে এবং একেকজন সদস্যকে নির্দিষ্টভাবে তাকফির করারও বিরোধিতা করেছে।

এদের মাঝে রয়েছেন:

১. ইমাম বাইহাকি (রহ.)।তিনি বলেন—

والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة في تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفراً دون كفر

[৬৬] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১২/৪৮৭-৪৮৮

“এসব বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ি ও অন্যান্য ইমামদের কাছ থেকে আমরা যা বর্ণনা করলাম, এগুলো দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, ছোট কুফর”।[৬৭]

২. ইমাম বাগাবি (রহ.)।তিনি বলেন:

وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق فهذا القول منه دليل على أنه أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفراً دون كفر

“ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বিদআতির সাক্ষ্য ও তার পেছনে সালাত পড়াকে সাধারণভাবেই জায়েয বলেছেন, যদিও মাকরুহ হবে। তার এ কথাই এ বিষয়ের ওপর দলিল যে, তিনি কোনো কোনো স্থানে এসব গ্রুপের কোনোটির ক্ষেত্রে ছোট কুফর অর্থে কুফর শব্দ ব্যবহার করেছেন”।[৬৮]

আর আরেক দল আলিম তাদের দলীয়ভাবে, এককভাবে, সার্বিকভাবে তাকফির করেছেন এবং ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিয়েছেন।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وهو قول الأكثرين

---

[৬৭] আস সুনানুল কুবরা-১০/২০৭

[৬৮] শরহুস সুন্নাহ- ১/২২৮

“এটাই অধিকাংশ আলেমের মত”।[৬৯]

আমাদের কাছে ইতিমাঝেই এ সব মতগুলোর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়েছে। বিশুদ্ধ কথা হলো বিশ্লেষণ করা, যেমন, পূর্বে আলোচিত হলো।

কিন্তু এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, তাবীলকারীদের কাউকেই নির্দিষ্ট করে কোনোভাবেই তাকফির করা যাবে না। এটা তো ওইসব লোকদের কথার মতোই ভুল, যারা তাদের ব্যাপকভাবে তাকফির করে।

কেননা, ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও কিছু কিছু জাহমিয়াদের নির্দিষ্ট করে তাকফির করার কথা বর্ণিত আছে। যেমনটা ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন।

আরেকটি বিষয় জেনে রাখতে হবে যে, পূর্বোক্ত আলোচনাগুলো ছিলো কুফরি বিদআতের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে, যে বিদআতকে কুফর হিসাবেই গণ্য করা হয় না, তার ব্যাপারে আদৌ এ আলোচনা প্রযোজ্য নয়।

---

[৬৯] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১২/৪৮৭

তাবীলকারী ও (মুলহিদদের) অবিশ্বাসীদের মাঝে পার্থক্য:

ইমামদের বক্তব্যগুলোর এই পর্যালোচনার মাধ্যমে দুই শ্রেণির ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল:

এক. ওইসব ব্যক্তি, যাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, কিন্তু তারা পথ চিনতে ভুল করেছে, ফলে সঠিক উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারেনি।

দুই. ওইসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত আদর্শের বিরোধিতায় লিপ্ত। তার আদেশের কোনো মূল্যায়নই করে না। তার আনিত আদর্শকে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের উদ্দেশ্যই হলো, শত্রুতা করা ও মুখ ফিরিয়ে নেয়া। যখন তাদের কোনো ঘটনা ঘটে, তখন এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী আদেশ আছে, তার প্রতি সামান্যও দৃষ্টিপাত করে না। এমন ব্যক্তিরা যদিও ইসলামের কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে বলুক না কেন, তারা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মাঝে নিকৃষ্ট কাফির, তার দ্বীন থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত।

এ কারণেই তাদের অনেকে আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী শাসকদের তাকফির না করার ব্যাপারে এই প্রমাণ দেয় যে, ইমাম আহমাদ (রহ.)

খলিফা মামুন ও মুতাসিমকে তাকফির করতেন না, অথচ তার মতানুসারে তারা অনেক কুফরি কথা বলতো। যেমন কুরআনকে মাখলুক বলতো, আল্লাহর আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিয়াদের মতো কথা বলতো।

অথচ এই দুই গ্রুপের মাঝে কতই না পার্থক্য!!! এক গ্রুপ সত্য পেতে চায়, কিন্তু তাতে ভুল করে। কিন্তু সে নিজের মাঝে এবং উম্মাতের মাঝে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়ন করতে চায়। আর আরেক গ্রুপ ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা উত্তোলন করে এবং মনে করে, আইনপ্রণয়ন ও বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার নেই।

এছাড়া আপনার কাছে এই দুই গ্রুপের মাঝেও পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যাদের এক গ্রুপ হলো যিন্দিক। যেমন ইসমাইলিয়া, কারামাতিয়া, দারযিয়া এবং যারা এ যামানায় তাদের সাথে সাদৃশ্য রেখে বলে—কুরআন হলো বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা বা কুরআন হলো উপদেশগ্রন্থ; বিধান গ্রন্থ নয় বা সাহিত্যগ্রন্থ; পথপ্রদর্শনকারী গ্রন্থও নয়। অথবা বলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ আমাদের ওপর আবশ্যক নয়; এটা শুধু তার যামানার জন্য আবশ্যক ছিলো। অথবা বলে যে, বর্তমানে আল্লাহর বিধানে উপকার হবে না এবং সমাজ সংস্কারে এর কোনো মূল্য নেই।

আর আরেক গ্রুপ হলো ওইসব তাবীলকারী, যারা যদিও কুফরি কথা বলে, কিন্তু তারা তা কোনো আয়াত বা হাদিসের তাবীল করে কুফরি কথা বলে।তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত্যই করতে চায়, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাই, তারা যদিও পথভ্রষ্ট, কুফরি কথা বলে, কিন্তু তাদের একেক জন সদস্যকে নির্দিষ্টভাবে তাকফির করতে হলে অবশ্যই তার ক্ষেত্রে বিচারিক মূলনীতিসমূহ কার্যকর করতে হবে; অর্থাৎ দেখতে হবে যে, সব শর্ত পাওয়া যায় কি না এবং প্রতিবন্ধকগুলো শেষ হয়েছে কি না।

তথাপি এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, তাবীলকারীদের কখনো কিছুতেই তাকফির করা যাবে না; বরং কখনো এমন হতে পারে যে, কোনো আলেম, গবেষক বা মুফতির দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির নাস্তিকতা ধরা পড়বে, কিন্তু একই কথা আরেক জন ব্যক্তি বলা সত্ত্বেও তার ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে না। এটা কোনো সাংঘর্ষিকতা বা বিরোধ নয়। যদিও যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে না, তার কাছে এটা বিরোধ ও সাংঘর্ষিকতাই মনে হবে।

হে আল্লাহ! জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব! আসমান ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত! আপনিই আপনার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন, যে বিষয়ে তারা বিবাদ করছে। যে হকের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাপারে আপনি

আমাকে নিজ অনুগ্রহে পথপ্রদর্শন করুন! নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা দেন।